জুন ১৯৮৯

কিশোর জ্ঞান বিজ্ঞান

পরিবেশ সংখ্যা ঃ আমরা ও পরিবেশ

লিখেছেন ঃ তারকমোহন দাস, সমরজিৎ কর, সুধাংশু পাত্র

এক ডজন নতুন বই

পাঁচটি কিশোর ক্ল্যাসিকস্

অন্নদাশঙ্কর রায় ॥ বিন্নি ধানের খই ৮
সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় ॥ কিশোর গল্প সমগ্র ৩০
হেমেন্দ্রকুমার রায় ॥ প্রেতাত্মার প্রতিশোধ ৮
শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায় ॥ হারানো কাকাতুয়া ১০
সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় ॥ ছোটদের শ্রেষ্ঠ গল্প ১০

পাঁচটি জ্ঞান-বিজ্ঞানের বই

সমরজিৎ কর ॥ পরমাণু প্রসঙ্গ ১৫
জয়ন্ত বসু ॥ পদার্থ বিজ্ঞানের বিস্ময় ১৫
অমরনাথ রায় ॥ সায়েন্স এক্সপেরিমেন্টস্ ১০
পার্থসারথি চক্রবর্তী ॥ বুদ্ধি নিয়ে খেলা ১০
বিমান বসু ॥ নক্ষত্র পরিচয় ১০

এবং দুটি অতি প্রয়োজনীয় বই

সমরজিৎ কর সম্পাদিত

স্টুডেন্টস বুক অফ নলেজ ৫০

অমরনাথ রায় সম্পাদিত

স্টুডেন্টস সায়েন্স এনসাইক্লোপিডিয়া

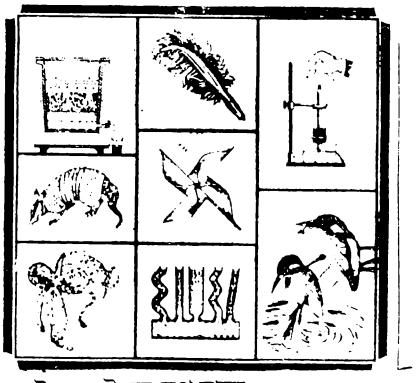

ছোটদের বইয়ের স্বপ্ন রাজ্য

শৈব্যা প্রকাশন বিভাগ ৮৬/১ মহাত্মা গান্ধী রোড কল-৯

ছোটদের জন্যে কলম ধরেছেন বর্ষীয়ান লেখক, বিজ্ঞানী ও শিক্ষাবিদগণ···

কারণ আজকের দিনের স্কুলের ছেলেমেয়েদের আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত পাঠক্রমের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে পড়তে হয় অনেক বই। শুধু সিলেবাসের পড়া সম্পূর্ণ করার জন্যই নয়, অজানাকে জানার আগ্রহ ও তাদের খুব। অথচ স্কুলের ছেলেমেয়েদের অসীম কৌতূহল মেটাতে পারে এমন প্রকাশিত বইয়ের সংখ্যা খুবই অল্প। তাই ছোটদের জন্যে বিশেষতঃ স্কুলের ছেলেমেয়েদের জন্য একখণ্ডে সম্পূর্ণ একটি সাধারণ জ্ঞানের বই (বুক অব নলেজ) প্রকাশের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। যে পরিকল্পনাকে সফল করতে এগিয়ে এসেছেন কুড়িজন সেরা লেখক, বিজ্ঞানী ও শিক্ষাবিদগণ যাঁদের লেখার সঙ্গে ছোটরা বিশেষভাবে পরিচিত।

বিচিত্র এই পৃথিবী গঠন কেমন, কবে কিভাবে পৃথিবীর বুকে প্রাণের স্পন্দন দেখা দিয়েছিল—সেইসব বিচিত্র উদ্ভিদ ও প্রাণীর ক্রমবিবর্তনের পর কিভাবে আবির্ভাব হল মানুষের ? মানুষের সভ্যতা ও সংস্কৃতির ইতিহাসও বড় রোমাঞ্চকর ইতিহাস। এই পর্যায়ে লিখবেন :

দিলীপকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, সুধাংশু পাত্র, সলিল রাহা, উজ্জ্বলকুমার মজুমদার, ধীরেন্দ্রলাল ধর ও নারায়ণ সান্যাল।

শিল্প ও সভ্যতার অগ্রগতির সঙ্গে এগিয়ে চলল বিজ্ঞানের জয়রথ। গুহাবাসী মানুষের আগুনের ব্যবহার থেকে শুরু করে আজকের মানুষ এসে পৌঁছেছে ইলেকট্রনিক্স-এর যুগে। শুধু পৃথিবীর বুকেই মানুষ নিজেকে আটকে রাখেনি, পাড়ি জমিয়েছে মহাকাশের বুকে, অভিযান চালিয়েছে সমুদ্রের অতলে। আবিষ্কারের সঙ্গে মানুষ খুঁজে বেড়িয়েছে তার আনন্দের উপকরণও। বিজ্ঞানের গবেষণা ও সাফল্যের আনুপূর্বিক বিবরণ লিখবেন :

ক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য, অমরনাথ রায়, অজয় চক্রবর্তী, বিমান বসু, সমরজিৎ কর, সিদ্ধার্থ ঘোষ, অজয় দাশগুপ্ত, সুবীর দত্ত, সিদ্ধার্থ রায়, অমিত চক্রবর্তী, রজত রায় এবং পার্থসারথি চক্রবর্তী।

আর কিভাবে সৃষ্টি হয়েছিল আমাদের এই সুজলা সুফলা পৃথিবীর ? এবং আমাদের এই বর্তমান পৃথিবীকে ভবিষ্যৎ পরিণতিই বা কী—এ নিয়ে লিখবেন প্রেমেন্দ্র মিত্র ও লীলা মজুমদার।

সমরজিৎ কর সম্পাদিত

স্টুডেন্টস বুক অব নলেজ

কিশোর জ্ঞান বিজ্ঞান

নবম বর্ষ 3য় সংখ্যা
জুন 1989

সূচীপত্র

চিঠিপত্র ঃ 4

কিশোর বিজ্ঞানীর দপ্তর ঃ যে দিনটি মনে রাখা দরকার ॥ সমরজিৎ কর 7

প্রচ্ছদ নিবন্ধ ঃ সুন্দরবন জীবন ও জীবিকা ॥ তারকমোহন দাস 19 ঃ পরিবেশ ও মানুষ ॥ পার্থসারথি চক্রবর্তী 21 ঃ কীটনাশকের দৌরাত্ম্য-গ্রামে ও সহরে ॥ সুধাংশু পাত্র 29 ঃ কলকাতার পরিবেশ ॥ কিন্নর রায় 39 ঃ তেজস্ক্রিয়তা ও পরিবেশ দূষণ ॥ গোপাল কর 47 ঃ প্রকৃতি-পড়ুয়া রবন্দ্রীনাথ ॥ দেবব্রত মুখোপাধ্যায় 49 ঃ জল দূষণ ও আমরা ॥ এণাক্ষী বিশ্বাস 27

পড়াশোনা ঃ কেমন করে মুক্তি পাব ॥ সমীরকুমার ঘোষ 15 ঃ জ্যামিতি সমস্যা ॥ নিখিলরঞ্জন বালা 16 ঃ তরলের নিজস্ব আকৃতি ॥ শ্যামাপ্রসাদ কর্মকার 17

জীবজন্তু ঃ তারামাছ ॥ শৈবাল কুমার গুহ ঃ মাছেদের বিচিত্র খবর ॥ বরুণ মজুমদার 13 ঃ জীবজন্তুর বিচিত্র গল্প ॥ অমরনাথ রায় 56 ঃ এক দুঃসাহসিক সমুদ্র অভিযানের পরিকল্পনা ॥ ঋতংকর দত্ত 35

শরীর-স্বাস্থ্য-চিকিৎসা ঃ ড্রাগ ॥ শান্তনু মিত্র 48

নিজে নিজে কর ঃ মডেল এর রকমফের ॥ নির্মলেন্দু বিকাশ পাত্র 51 ঃ মডেল বানাতে গিয়ে ॥ রাজেশ গিরি 59 ঃ মডেল রেকর্টিফায়ার ॥ শ্রীমন্ত গুহ 65

সায়েন্স এক্সপেরিমেণ্ট ঃ ব্যাটারির সাহায্যে লেখা ॥ সুজন পাল 10 ঃ গ্লিসারিনের গুণবিচার ॥ ইন্দ্রনীল বসু 10

ফিচার ও ছবিতে গল্প ঃ বুদ্ধিশুদ্ধি ॥ সমীর মণ্ডল 11 ঃ উভচর মানব (আলেকজাণ্ডার বেলায়েভের কাহিনী অবলম্বনে) ॥ অনিল কর্মকার ও গৌতম কর্মকার 43 ঃ খুদে বৈজ্ঞানিক ॥ দিলীপ দাস 23

বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানী ঃ গোপালচন্দ্র ঃ একটি মূল্যায়ন ॥ শকুন্তলা ভট্টাচার্য 52

বিতর্ক ঃ ট্যাকিওন কি সত্যই আছে ॥ রাহুল রায় 9

ধারাবাহিক রচনা ঃ বোর্ণিওর বেরী ॥ সঙ্কর্ষণ রায় 31

প্রতিযোগিতা ঃ ক্যুইজ কনটেস্ট 55 ঃ শব্দকুট ॥ হিমাংশু পাল 58 ঃ আই কিউ টেস্ট 58

কিশোর বিজ্ঞান পরিষদ ঃ পরিষদের খবর 63 ঃ সফল উত্তরদাতাদের নাম 63 ঃ অন্যান্য সমাধান 58 ঃ বলতে পারো কেন ॥ সুধাংশু পাত্র 60

আগামী সংখ্যায়

প্রচ্ছদ নিবন্ধ
আর্কিড
লিখবেন
মৃত্যুঞ্জয়প্রসাদ গুহ

প্রধান সম্পাদক ঃ সমরজিৎ কর
সম্পাদক ঃ রবীন বল
সহ সম্পাদক ঃ জয়ন্ত দত্ত

কিশোর জ্ঞান বিজ্ঞানের পক্ষে রবীন বল কর্তৃক 86/1, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলকাতা-9 থেকে প্রকাশিত এবং চৌধুরী প্রিন্টিং ওয়ার্কস, P-21, সাহিত্য পরিষদ স্ট্রীট, কলকাতা-6 থেকে মুদ্রিত। দাম : 5·00 টাকা **প্রচ্ছদ ঃ** ঋতদীপ রায়

ভবিষ্যৎ প্রজন্মের স্বার্থে গড়ে তুলুন দূষণমুক্ত পৃথিবী

বিভিন্ন ধরনের পরিবেশ দূষণ বর্তমান যুগে আমাদের সামনে কঠিন সমস্যার সৃষ্টি করেছে। এই পরিস্থিতি কিন্তু একদিনে তৈরি হয়নি। প্রাকৃতিক নিয়মগুলিকে অগ্রাহ্য করে মানুষ আধুনিক জীবনের ক্রমবর্ধমান ও জটিল চাহিদার সামাল দিতে নানাভাবে প্রকৃতির কাজে হস্তক্ষেপ করেছে। উন্নততর জীবনযাত্রার প্রয়োজনে মাটি, জল, অরণ্য ও খনিজ সম্পদকে অবাধে মানুষ ব্যবহার করেছে—অতিব্যবহারের ফলে যে ক্ষতি তা পূরণের ব্যবস্থা না করেই। ফলশ্রুতি হিসাবে এই গ্রহে আমাদের অস্তিত্ব আজ বিপন্ন।

অবাধ বৃক্ষচ্ছেদন কলকারখানার বর্জ্য পদার্থ ঢেলে নদীর নির্মল স্রোতকে রুদ্ধ করা, যানবাহন ও কারখানা থেকে নিঃসৃত বিষাক্ত গ্যাস এবং ধোঁয়া ও কর্কশ উচ্চগ্রামের শব্দ আমাদের পরিবেশ দূষণের শিকার করে তুলেছে।

কিন্তু আমরা কি সম্ভাব্য এই বিপদ সম্বন্ধে অবহিত ?

যদি এই অবস্থা চলতে থাকে তাহলে অচিরেই পৃথিবী থেকে অরণ্য লুপ্ত হয়ে যাবে, খরা এবং বন্যার কবলে পড়বে পৃথিবী, প্রাণী ও উদ্ভিদজগতের অসংখ্য প্রজাতি চিরদিনের মত বিলুপ্ত হবে, আমাদের এই সুন্দর গ্রহের বাতাস হয়ে পড়বে নিঃশ্বাস নেবার অযোগ্য এবং এ সমস্তই ঘটবে আমাদের অপরিণামদর্শিতা লোভ ও প্রাকৃতিক সম্পদের ক্রমবর্ধমান চাহিদার জন্য।

উন্নয়নমূলক কাজকর্ম আমাদের চালিয়ে যেতে হবে। কিন্তু তা করতে হবে প্রাকৃতিক ভারসাম্যের হানি না ঘটিয়ে। নিষেধমূলক আইনের যথাযথ প্রয়োগ এবং আধুনিক প্রযুক্তিবিদ্যার সাহায্যে আমরা এই বিপদের মোকাবিলা করতে পারি।

পরিবেশ সংরক্ষণের কাজে ব্রতী হতে হবে আমাদের সকলকেই প্রস্তুত হতে হবে দূষণমুক্ত—পৃথিবী গড়ার উদ্দেশ্যে দীর্ঘস্থায়ী সংগ্রামের জন্য।

॥ পশ্চিমবঙ্গ সরকার ॥

আই. সি. এ. ২২৯৩/৮৯

পড়াশোনা ও মডেল

ফেব্রুয়ারী '89 সংখ্যায় চিঠিপত্র বিভাগে কয়েকটি ভুল চোখে পড়ল। যেমন—

(i) "দুই মাধ্যমের বিভেদ তলে আলোক রশ্মি বাঁকে কেন" এর উত্তর দাতা সূত্রটির নাম করেছেন স্নেল। কিন্তু প্রকৃত হওয়া উচিত "স্নেলের সূত্র" (Snell's law)।

(ii) ঐ উত্তরের সঙ্গেই উত্তর দাতা বলেছেন "a এবং b উভয় মাধ্যম যদি সমঋণত্বের হয়" কিন্তু হওয়া উচিত a এবং b উভয় মাধ্যম যদি সমঘনত্বের হয়"।

আশাকরি পরবর্তী সংখ্যায় সঠিক উত্তরটি ছেপে কিশোরদের সঠিক জানার আগ্রহী করে তুলবেন।

তপর মাজী, বাতড়া, বাঁকুড়া।

গত মার্চ '89 কিশোর জ্ঞান বিজ্ঞানের চিঠিপত্র বিভাগে একটি ভুল নজরে এল। পড়াশোনা বিভাগের চিঠিতে সোমনাথ ভট্টাচার্য্য শ্রী সমীর কুমার ঘোষের লেখা "ওহমের সূত্র" সম্পর্কে কিছু অপ্রয়োজনীয় মন্তব্য করেছেন। ওনার চিঠি থেকেই তুলে দিচ্ছি, সমীর ঘোষ মহাশয় ওহমের সূত্র বলতে গিয়ে বলেছেন, "পরিবাহীর উষ্ণতা ও অন্যান্য ভৌত অবস্থা অপরিবর্তিত থাকলে পরিবাহীর মধ্য দিয়ে তড়িৎ প্রবাহমাত্রা ; অপরিবাহীর দুই প্রান্তের বিভব পার্থক্যের সমানুপাতী হবে"। এখানে আমার বক্তব্য সমীরবাবু ঠিকই লিখেছেন। প্রথমতঃ সোমনাথবাবু বলেছেন যদি কোন পরিবাহী সমসত্ব হয় সেক্ষেত্রে রোধ ভিন্ন হতে পারে। এক্ষেত্রে সোমনাথ বাবুকে জানাই যে কোন পরিবাহীর রোধ যাই হোক না কেন, পরিবাহীটির উষ্ণতা ও অন্যান্য ভৌত অবস্থা পরিবর্তন না করলে ওর রোধ ধ্রুবক থাকবে, অর্থাৎ দুপ্রান্তের বিভব পার্থক্য বাড়ালে প্রবাহিত তড়িতের মান বাড়বে ও বিভব পার্থক্য কম হলে প্রবাহ মাত্রা কমবে। এর সাথে অপরিবাহীর সমসত্বতার কোন সম্পর্ক নেই। দ্বিতীয়ত সোমনাথবাবু বলেছেন, "এটা কিন্তু শুধুমাত্র একমুখী তড়িৎপ্রবাহ [D. C.] এর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য।" কিন্তু এটা সম্পূর্ণ ভুল কথা, সূত্রটি D.C. ও A C. প্রতিক্ষেত্রেই সমভাবে প্রযোজ্য, আসলে A.C. ও D.C. একই বিভব প্রভেদ যদি কোন inductive Resistance-এর দু প্রান্তে আলাদাভাবে দেওয়া যায়, সেক্ষেত্রে দেখা যাবে দুরকম প্রবাহমাত্রা হচ্ছে যদিও পরিবাহী দু প্রান্তের বিভব পার্থক্য সমান। আসলে inductive Resistance-এর ক্ষেত্রে impedence-এর জন্য এই ঘটনা ঘটে। Inductive পরিবাহীর এই impedence নির্ভর করে A. C. প্রবাহের frequency-এর উপর। তবে non-inductive resistance-এর ক্ষেত্রে A. C. ও D. C. উভয় ক্ষেত্রেই প্রবাহমাত্রা সমান হবে। সাধারণতঃ রোধ বলতে non-inductive রোধকেই বোঝানো হয়।

আরেকটি কথা, মার্চ সংখ্যারই নিজে নিজে কর বিভাগে দেখলাম "শুভাশিস বিশ্বাস তাঁর মশা তাড়ানোর যন্ত্র" নামক মডেলের Component-এ 2N 2646 ট্রানজিস্টারকে PNP বলে উল্লেখ করেছেন। এটি সম্পূর্ণ ভুল। আসলে ট্রানজিস্টারটি হল UJT বা Uni Junction Transistor এছাড়া সার্কিটে উনি press button switch এঁকেছেন কিন্তু এর কাজ কোথাও উল্লেখ করেননি। লেখক এব্যাপারে মতামত জানালে খুশি হব।

নির্মলেন্দু বিকাশ পাত্র, চামরাইল, হাওড়া।

ডাবের জল

গত জানুয়ারী '89 সংখ্যায় ডাবের উপকারিতা বা খাদ্যগুণ সম্বন্ধে পড়ে দ্বিধায় পড়তে হল। সুস্মিত রায়ের 'ডাবের জল এক অন্যতম উপকারী পানীয়'তে (49 পৃষ্ঠা) বলা হয়েছে ডাবের নানা খাদ্যগুণ সম্বন্ধে আবার সুধাংশু পাত্র-এর 'বলতে পার কেন ?' তে 62 পৃষ্ঠায় শেষ প্রশ্ন রয়েছে, ডাব খেলে শরীরেয় কতটুকু উপকার হয় ? তাতে বলা হয়েছে, ডাবের খাদ্যগুণ বিশেষ কিছু নেই বললেও চলে। এর ফলে ডাবের খাদ্যগুণ সম্বন্ধে কিছুই ভাল বোঝা যাচ্ছে না। এই সমস্যার সমাধান অর্থাৎ ডাবের খাদ্যগুণ সম্বন্ধে সঠিক তথ্য জানতে চাই। এই পত্রিকায় তা দেখতে পেলে খুশি হব।

অরণ্যকুমার নাগ, 62এ, হরিশ চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কলি-25।

হানাবাড়ি

মার্চ '89 সংখ্যায় 'বরলী রেক্টরি কি হানাবাড়ি' লেখাটি পড়লাম। লেখক যুক্তিপূর্ণ উপায়ে বাড়িটিকে স্বাভাবিক প্রতিপন্ন করতে পেরেছেন। এ রকম আরও লেখা কিশোর জ্ঞান বিজ্ঞানে পড়তে চাই। লেখকের কাছে প্রশ্ন— তিনি কি কলকাতা ও তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে কোনো ভুতুড়ে বাড়ির সন্ধান পেলে তদন্ত করতে যাবেন ? এ রকম বাড়ির কথা মাঝে মাঝে শুনতে পাই। তখন কোন ঠিকানায় যোগাযোগ করব ? আমেরিকায় অনেক ভূতের বাড়ি আছে কাজলবাবু কি সেগুলিকে নিয়ে লিখবেন।

প্রতিবেদনের সঙ্গে প্রকাশিত দ্বিতীয় ছবিটি কার ?

সমীর কুণ্ডু, ঘোষপাড়া লেন, কলকাতা 36।

জণ্ডিসের মালা

মার্চ, 89 সংখ্যায় জণ্ডিস সম্বন্ধে মৃন্ময় বিশ্বাসের প্রশ্নের উত্তরে জণ্ডিসের মালার বুজ্‌রুকির কথা বলা হয়েছিল এবং সুস্থ লোকের গলায় মালাটা পরিয়ে পরীক্ষা করলেই বুজরুকি ধরা পড়ে যাবে—একথাও বলা হয়েছিল।

আমি আনন্দের সঙ্গে জানাচ্ছি 19-3-89 তারিখে আমি ঐ পরীক্ষা করেছি এবং দেখেছি যে বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে আমার গলায় থাকা মালা কি সুন্দর ভাবে বেড়ে চলেছে। যদিও আমার জণ্ডিস হয়নি। এমনকি বিকাল থেকে পেরেকে টাঙানো মালাও আজ সকালে পাঁচ সেণ্টিমিটারের মত বেড়ে গেছে।

তাই আমি সমস্ত বিজ্ঞান মনস্ক পাঠককে জানাতে চাই যে জণ্ডিসের মালার মধ্যে কোনো অলৌকিক ছোঁয়া নেই এবং কাঁচা কাঠিগুলো শুকতে থাকে বলে পাকগুলো আলগা হয়ে বাড়তে শুরু করে যা সুধাংশু পাত্র মহাশয় এই পত্রিকায় বলেছিলেন, এবং আমি তা হাতে-কলমে করে দেখেছি এবং সুধাংশু বাবুর মতামত সর্বান্তঃকরণে সমর্থন করছি।

প্রকাশ দাস, বাঙ্গালপুর, হাওড়া।

ভি ডি ও

গত মার্চ 89 সংখ্যায় গিরীশ রায় বর্মন মহাশয়ের লেখা 'টি. ভি.-ভি. ডি. ও. এবং সিনেমার প্রভাব' নামক প্রবন্ধটি পড়লাম। কিন্তু উল্লেখ্য V. D. O. বলতে তিনি যে জিনিসকে বোঝাতে চেয়েছেন সেটার প্রকৃত নাম [Vidio], ভি. ডি. ও. [V. D. O.] নয়। কিছু দিন আগেই 'কিশোর জ্ঞান বিজ্ঞানে' এ সম্বন্ধে আলোকপাত করা হয়েছিল।

বাসুদেব ভট্ট, আলিপুর দুয়ার জং, জলপাইগুড়ি।

রঙিন ফটকিরি

মার্চ 1989 সংখ্যার কিশোর জ্ঞান বিজ্ঞানে প্রকাশিত 'রঙিন ফটকিরি' সম্বন্ধে আমি কিছু বলতে চাই। লেখক রঙিন ফটকিরি তৈরি করার জন্য সুলেখা কালি ব্যবহার করতে বলেছেন। কিন্তু আমার মনে হয় এই পরামর্শ মোটেই স্বাস্থ্যকর নয়. কারণ ফটকিরি ব্যবহার করা হয় Antiseptic agent হিসাবে। এখানে সুলেখা কালি ব্যবহার করলে ফটকিরির Antiseptic ধর্ম তো কমে যাবেই উপরন্তু সুলেখাকালি ব্যবহার করায় মেরোগ হওয়ার সম্ভাবনাও যথেষ্ট। তাই আমার মনে হয় এস্থলে সুলেখা কালির পরিবর্তে Medicinally active dye ফেলে Acrifiarih, Brilliant-green অথবা Gentian violet ব্যবহার করাই উচিত, কারণ উপরোক্ত ডাইগুলির প্রত্যেকেরই Antiseptic ধর্ম আছে এবং অতি অল্প পরিমাণ ডাই দিলেই অনেক বেশি ঘন রঙ হবে।

এই সংখ্যাতেই 'চেনা-অচেনা ফুল' বিভাগে এণাক্ষী বিশ্বাস লিখেছেন 'আবার ইহা ওষধি গাছও।' প্রকৃত পক্ষে কথাটি হযে ভেষজ উদ্ভিদ বা ঔষধি গাছ। কারণ ওষধি কথাটির মানে হলো যে গাছ একবার ফল দিয়াই মরিয়া যায়। উপরোক্ত বিভাগগুলির লেখক লেখিকাদের মতামত চাই।

প্রসেনজিৎ মাজী ও সুখময় সিকদার, ইনস্টিটিউট অফ ফার্মাসী, বাঁকুড়া।

মডেল নির্মাণ

কিশোর জ্ঞান বিজ্ঞান পত্রিকার গত ফেব্রুয়ারী 1989 সংখ্যায় 'নিজে নিজে কর' বিভাগে যে 'অটো পাওয়ার স্টেশন' শীর্ষক মডেলটি প্রকাশিত হয়েছে, তা সম্পূর্ণ অবাস্তব। এই মডেলটি শক্তির নিত্যতা সূত্রের বিরোধী, এই ধরনের যন্ত্র যদি সম্ভব হত তাহলে পৃথিবীর যাবতীয় শক্তি সম্পর্কিত সমস্যার সমাধান হয়ে যেত। এ বিষয়ে আলোকপাত করতে অনুরোধ করছি।

সাল্লন মহলানবীশ, বীরভূম জেলা স্কুল, সিউড়ী, বীরভূম।

কুমীরের কান্না

জানুয়ারী 1989 সংখ্যায় জীবজন্তু বিভাগের কৌশিক ভট্টাচার্যের 'কুমীরের কান্না' পড়লাম। এতে দেখলাম যে, ফরাসী ডাক্তার ব্যোমবার্ড সাহেবের নাম উল্লেখ আছে। এখানে হবে ফরাসী ডাক্তার এ. বয়েমার এবং আরও একটি ভুল পড়লাম যে, তিনি রবারের নৌকায় 65 দিন অতলান্তিকে ভেসে বেড়িয়ে ছিলেন এবং তাঁর ঐ কদিন শরীর অটুট ছিল। কিন্তু প্রকৃত তাঁর শরীর অটুট ছিল না।

জাহাঙ্গীর মণ্ডল, বিজলা, কেওটার, বর্ধমান।

তুলসী গাছ

ডিসেম্বর '88 সংখ্যায় চিঠিপত্র বিভাগে প্রকাশিত 'দুর্গাপ্রসন্ন মুখার্জীর পত্রের পরিপ্রেক্ষিতে গত মার্চের (1989) সংখ্যায় চিঠিপত্র বিভাগে যে জুঁই কুণ্ডুর চিঠি প্রকাশিত হয়েছে তার প্রসঙ্গে আমি জানাচ্ছি উনি তুলসী গাছের যে বৈজ্ঞানিক নাম জেনেছেন তাতে কিছু ভুল আছে। তাই আমি এই প্রসঙ্গে জানাই যে তুলসী গাছের বৈজ্ঞানিক নাম Ocimum Sanctum Linn (অসিমান স্যাঙ্কটাম)। আমার মনে হয় শ্রী রবীন্দ্রনারায়ণ পালের নবম. দশমের বায়োলজি বইতে মুদ্রণে-প্রমাদ হয়েছে।

সুমিতকুমার পাল, 21, শশীভূষণ সরকার লেন, হাওড়া-6।

কিশোর বিজ্ঞানীর দপ্তর

যে দিনটি মনে রাখা দরকার

সমরজিৎ কর

বছর পঁয়তাল্লিশ আগে এ অভিজ্ঞতা অনেকেরই হত। তখন আমরা প্রাথমিক শ্রেণীর ছাত্র। মনে পড়ে, ওই সময় চৈত্রের শেষ অথবা বৈশাখের প্রথম কবে হবে তা জানতে আমাদের আর পাঁজির দরকার হত না। সেটা জানান দিত কাল বৈশাখী। কাল বৈশাখী এলেই আমরা বুঝতে পারতাম। হয় চৈত্র মাস শেষ হতে চলেছে। নয়তো বৈশাখ শুরু হল এবার।

আসলে, গত পঁয়তাল্লিশ বছরে কত কীই না পাল্টে গেছে। বর্ষা এলে আগের মত সেই ব্যাঙের ডাক আর শোনা যায় না; বাঁশ বনের আড়ালে ডাকে না ডাহুক; পানকৌড়ি, বক বহু জায়গাতেই এখন অদৃশ্য। এক সময় মনে হত এ সব বুঝি প্রকৃতির খেয়ালেই ঘটছে। কিন্তু সেটা যে ভুল, এখন অনেকেই তা বুঝতে পেরেছে। বুঝতে পেরেছে, পৃথিবীর পরিবেশ এখন বিপর্যস্ত। আর তার জন্যে মানুষই অনেকাংশে দায়ী।

আবহাওয়ার কথাই ধরো। জ্বালানির জন্য দরকার কাঠ। ঘরবাড়ি আসবাবপত্র তৈরির জন্যে দরকার কাষ্ঠ। নানা রকম রাসায়নিক শিল্প, যেমন কাগজ, রেয়ন প্রভৃতির জন্যেও দরকার কাঠ। এত কাজে কাঠ যোগাতে গিয়ে মানুষ অরণ্যে গাছপালা করছে নির্মূল। জন সংখ্যা বেড়েছে প্রচুর। এত মানুষের খাবার যোগাতে গেলে দরকার প্রচুর খাদ্য শস্য। তার জন্যেও তো জমি দরকার। সেই জমি বের করতে গিয়েও বহু জায়গায় অরণ্যের গাছপালা কেটে ফেলা হয়েছে। পার্বত্য এলাকায় তৈরি হচ্ছে বড় বড় রাস্তা —বন কেটে। এর ফলেও কমে এসেছে বনের গাছপালা। এ সব করার দরুন অবস্থা হয়েছে এই ঃ বহু অঞ্চলের মাটি হয়েছে আলগা। বর্ষার জলে সেই মাটি ধুয়ে যাচ্ছে নদীনালায়। নদী-নালা মজে গেছে বহু জায়গায়। প্রচণ্ড বর্ষায় সে সব নদী নালা জল বইতে পারে না। বর্ষার সময় তাই তদের দুকূল ছাপিয়ে ছড়িয়ে পড়ে জল। আসে বন্যা। বন্যা বেড়েছে। আলগা মাটির ধুলো সুখিয়ে গিয়ে বাতাসে মিশছে প্রচুর। এখন কত জায়গাতেই না ধুলোর ঝড়। বাতাসে ধূলি কণা বেশি জমলে আবহাওয়ার হয় পরিবর্তন।

কলকারখানায় জ্বালানি হিসেবে ব্যবহার করা হয় খনিজ কয়লা এবং প্রাকৃতিক তেল এবং গ্যাস। জ্বালানি কাঠ কয়লা তেল গ্যাস—গৃহস্থালীর কাজেও জ্বালান হচ্ছে প্রচুর। কোটি কোটি গাড়ি চলে পৃথিবীর সর্বত্র। সে সব গাড়িতে ব্যবহার করা হয় পেট্রোল ডিজেল। আর তাদের থেকে নির্গত কার্বন-ডাই-অক্সাইড, কার্বন মনোকসাইড, নাইট্রোজেনের অক্সাইড, গন্ধকের অকসাইড মিথেন, প্রভৃতি বাতাসে মিশছে। এদের মধ্যে সবচেয়ে বিপদজ্জনক কার্বন ডাইঅকসাইড, নাইট্রোজেনের অকসাইড এবং মিথেন। এ সব গ্যাস ভূপৃষ্ঠ থেকে বিকীর্ণ উত্তাপকে ধরে রাখে, যেমন শীতের সময় লেপ কম্বল গায়ে দিলে তাদের মধ্যে ধরা পড়ে গায়ের উত্তাপ। গাছপালা নিজেদের জন্যে শর্করা খাদ্য তৈরি করে কার্বন ডাইঅকসাইড নিয়ে। সালোক-সংশ্লেষণ প্রক্রিয়ায়। গাছপালা কমে যাওয়ায়, ওই কারণে কারবন ডাইঅকসাইডের ব্যবহার হচ্ছে কম। ফলে বাতাসে কার্বন ডাইঅকসাইড বাড়ছে আরো। বাতাসের তাপমাত্রা বাড়ছে। এর ফলেও আবহাওয়ায় দেখা দিয়েছে গোলমাল। যে সব অঞ্চলে বৃষ্টি হত প্রচর, এখন হয় না। যে সব অঞ্চলে বৃষ্টি হত কম, সেখানে বৃষ্টি বেড়েছে। জলঝড়ের এখন আর সময় নেই। চাষীদের পড়েছে মাথা হাত। যেমন হল এবার। চৈত্র বৈশাখে বৃষ্টি নেই। পশ্চিমবঙ্গের বহু অঞ্চলে মাঠের বোরো ধানের চারা মাঠেই শুকিয়ে গেল।

অধিকফলনশীল শস্য চাষ করতে দরকার প্রচুর সার। যার বেশির ভাগটাই নাইট্রোজেন সার। জমিতে দেওয়া নাইট্রোজেন সারের অনেকটা রাসায়নিক ভাবে ভেঙে গিয়ে তৈরি করে নাইট্রোজেনের অকসাইড। বাতাসে এই গ্যাসটির মাত্রা বাড়লেও বাতাসের তাপমাত্রা বাড়ে। অকসিজেনের সঙ্গে ওই গ্যাস বিক্রিয়া করে তৈরি করে ওজন গ্যাস। বাতাসের তাপমাত্রা বাড়লে আবহাওয়ায় পরিবর্তন হয়। জমির উপর দিয়ে যে বাতাস বয়, তাতে ওজনের মাত্রা বাড়লে ফসলের ক্ষতি হয়।

সমস্যা কি কম? নদী এবং সমুদ্র উপকূলবর্তী অঞ্চলে বসেছে কলকারখানা। সে সব কারখানা থেকে নানা রকম রাসায়নিক জঞ্জাল হিসেবে ছাড়া হয় নদী এবং সমুদ্রে। এর

ফলে বহু অঞ্চলে মাছ এবং অন্যান্য জলচর প্রাণী যারা যাচ্ছে। কীটপতঙ্গের হাত থেকে ফসল রক্ষার জন্যে ব্যবহার করা হয় বিষাক্ত রাসায়নিক যৌগ। তারাও জলাশয়ে পড়ে মাছের ক্ষতি করেছে প্রচুর। ছোট বয়েসে দেখেছি, বর্ষার জল ক্ষেতের জমি থেকে অনেকটা নেমে গেলে সেখানে পাওয়া যেত প্রচুর কই সিঙ্গি মাগুর মাছ। এখন সে তো স্বপ্ন। জমিতে ছড়ান হয়েছে প্রচুর ডিডিটি। সেই ডিডিটি গাছপালা এবং অন্যান্য প্রাণীর শরীরে জমে। তাদের খাবার হিসেবে ব্যবহার করায় বহু প্রজাতির পাখি প্রায় শেষ হয়ে গেছে। ডিডিটি তাদের ডিমের খোলা করে ফেলে নরম। ডিম পাড়ার সময় ডিমগুলির খোলা ভেঙ্গে যায়। ফলে তা থেকে আর শাবক জন্মায় না। অনেকের ধারণা বক, ডাহুক, পানকৌড়ি এই কারণেই শেষ হয়ে এসেছে।

আমাদের জীবন এখন শক্তি নির্ভর। শক্তি বলতে প্রধানত উত্তাপ এবং বিদ্যুৎ। বহু বছর ধরে উত্তাপ এবং বিদ্যুতের জন্যে আমরা নির্ভর করে এসেছি জীবাশ্ম জ্বালানির উপর। জীবাশ্ম জ্বালানি বলতে কয়লা, খনিজ তেল, মানে পেট্রোল এবং ডিজেল এবং প্রাকৃতিক গ্যাস। এ সবের ভাণ্ডার দ্রুত কমে আসছে। তাই বিকল্প হিসেবে নির্ভর করতে হচ্ছে পারমাণবিক শক্তির উপর। পারমাণবিক শক্তির জন্যে জ্বালানি হিসেবে ব্যবহার করা হচ্ছে ইউরেনিয়াম। ইউরেনিয়াম পরমাণুকে নিউট্রন কণার সাহায্যে প্রচণ্ড ভাবে আঘাত করলে ভেঙ্গে গিয়ে তৈরি করে নানা রকম তেজস্ক্রিয় আইসোটোপ—স্ট্রনশিয়াম আইওডিন, প্রভৃতি। সেই সঙ্গে উৎপন্ন হয় প্রচণ্ড পরিমাণ উত্তাপ শক্তি। উত্তাপ শক্তির সাহায্যে জলকে বাষ্পে পরিণত করা হয়। সেই বাষ্পের চাপে ঘোরান হয় টারবাইন। টারবাইনের সঙ্গে জোড়া থাকে জেনারেটার। টারবাইন ঘুরলে জেনারেটার চলে। উৎপন্ন হয় বিদ্যুৎ শক্তি। কিন্তু মুশকিল দাঁড়িয়েছে ওই তেজস্ক্রিয় আইসোটোপগুলি নিয়ে। যাদের বলা হয় পারমাণবিক জঞ্জাল। সেই জঞ্জাল যাতে পরিবেশে না ছড়ায় তার জন্যে চেষ্টা চলছে বিস্তর। তবু ভয়। যদি তারা কোন ভাবে যথেষ্ট সাবধানতা সত্ত্বেও পরিবেশে ছড়িয়ে পড়ে, তা হলেই তো বিপদ। ওই সব তেজস্ক্রিয় আইসোটোপ জল, বাতাস এবং খাদ্যের মাধ্যমে শরীরে প্রবেশ করলে ক্যানসার থেকে ঘটতে পারে নানা রকম দূরারোগ্য রোগ। অনেক সময় দুর্ঘটনার দরুনও পারমাণবিক শক্তি উৎপাদন কেন্দ্র থেকে ছড়াতে পারে তেজস্ক্রিয় আইসোটোপ। যেমন ঘটেছিল মার্কিন দেশের থ্রিমাইলস আইল্যাণ্ডে, অথবা সোভিয়েত দেশের চেরনোবিল-এ।

গাছপালা কেটে ফেলার দরুন আবহাওয়ার পরিবর্তন হয়েছে অনেক জায়গায়। মরুভূমি সম্প্রসারিত হচ্ছে। সংবাদে বলা হয়েছে ভারতের থর মরুভূমি ক্রমে দিল্লীর দিকে এগিয়ে আসছে। তার থাবা গ্রাস করতে চলেছে পাঞ্জাবকেও।

রেফ্রিজারেটারে ব্যবহার করা হচ্ছে এক শ্রেণীর রাসায়নিক যৌগ। যাদের বলা হয় ক্লোরোফ্লুরো কারবন বা CFC। রেফ্রিজারে ঠাণ্ডা বজায় রাখতে ব্যবহার করা হয় এই যৌগ। এ ছাড়াও রঙ, গন্ধদ্রব্যের স্প্রে, প্লাস্টিক ফোমেও এই যৌগগুলি প্রচুর ব্যবহার করা হচ্ছে। ব্যবহারের সময় তারা মুক্ত হয়ে বাতাসে মেশে। চলে যায় ঊর্ধ্বাকাশে। ঊর্ধ্বাকাশে গিয়ে ওজন স্তরের ওজন গ্যাসের সঙ্গে বিক্রিয়া করে। এর ফলে হাল্কা হয়ে আসছে ওজনস্তর। সূর্য থেকে বিকীর্ণ হয় নানা রকম রশ্মি। তাদের মধ্যে একটি অতিবেগুণী রশ্মি। এই রশ্মির একটি অংশ শরীরের পক্ষে ক্ষতিকর—তার স্পর্শে মানুষ এবং অন্যান্য প্রাণীর দেহে ক্যানসার হতে পারে। ওজন স্তর এ ধরনের অতিবেগুণী রশ্মি শুষে নেয় বলে এমন ক্ষতির সম্ভাবনা এতদিন কম ছিল। কিন্তু CFC বিক্রিয়া করে ওজন স্তরকে হাল্কা করছে। ফলে ভূপৃষ্ঠে বেড়েছে ক্ষতিকর অতিবেগুণী রশ্মির মাত্রা। এ ছাড়াও ওই বেগুণীরশ্মি ভূ-পৃষ্ঠের কাছাকাছি অঞ্চলের বাতাসকে উত্তপ্ত করে। ফলে ভূপৃষ্ঠের কাছাকাছি অঞ্চলের বাতাসের তাপমাত্রা বাড়ছে।

সমুদ্রের নিচের ভূস্তরের অভ্যন্তর থেকে তোলা হচ্ছে তেল এবং গ্যাস। বড় বড় ট্যাঙ্কার জাহাজ বয়ে নিয়ে যায় পেট্রোলিয়াম। এই পেট্রোলিয়াম সমুদ্রের বহু অঞ্চলে জলকে করছে দূষিত। মারা পড়ছে জলচর প্রাণী। গাড়ি-ঘোড়ার শব্দে বড় বড় শহর এখন যেন হাট। আগের মত শব্দ শোনার ক্ষমতা অনেকেরই এখন আর নেই। শহর-গুলির পয়প্রণালীর জঞ্জালও এখন বড় রকম সমস্যা। দূষিত করছে বাতাস। দূষিত করছে পানীয় জল।

বলতে কি, পরিবেশ নিয়ে সমস্যা এখন হাজারো। এই সমস্যা সম্বন্ধে পৃথিবীর সব মানুষ যাতে অবহিত হয়, সেই সঙ্গে সতর্ক, এবং প্রয়োজনে এ সব সমস্যা মোকাবিলায় যাতে সবাই এগিয়ে আসে সেটা স্মরণ করিয়ে দিতে প্রতি বছরই পালন করা হয়। বিশ্ব পরিবেশ দিবস। সে দিনটি 5 জুন। সে দিনটিতে—এসো, আমরা প্রতিজ্ঞা করি যে যেভাবেই পারি আমাদের পরিবেশকে আমরা জঞ্জাল মুক্ত করবো। একটি করে গাছ পুঁতবো আমরা, প্রত্যেকে। পরিবেশের সমস্যা নিয়ে আমরা আলোচনা করবো নিজেদের মধ্যে। এ দিনটির কর্তব্য সম্বন্ধে ভুললে চলবে না।

'ট্যাকিওন' কি সত্যই আছে ?

রাহুল রায়

এপ্রিল 1989 সালের 'কিশোর জ্ঞান বিজ্ঞানে বিতর্ক বিভাগে সৌমিত দাসের লেখার পক্ষে আমার এই নিবন্ধ।

আইনস্টাইনের তত্ত্বানুযায়ী বস্তুর ভর ঐ বস্তুর বেগের উপর নির্ভর করে এবং বস্তুর বেগ আলোকের গতিবেগের সমান হলে, ভর 'অসীম' হবে। এই সম্পর্কিত সমীকরণ নিম্নরূপ :

$$m = \frac{m_0}{\sqrt{1 - V^2/C^2}}$$

m_0 = স্থির অবস্থায় বস্তুর বেগ, m = গতিভর, তাহলে বস্তুকে V গতিতে আনলে তাদের মধ্যে সম্পর্কটি উপরি উক্ত সমীকরণ দ্বারা প্রকাশ পায়, যখন C = আলোকের বেগ।

আইনস্টাইনের মতানুযায়ী আমাদের জগতের সর্বোচ্চ গতিশীল হল আলোক। তাই তিনি স্ব-উদ্ভূত সমীকরণে আলোর গতিবেগকে একটি গুরুত্বপূর্ণ আসনে অধিষ্ঠিত করেছেন। এটি দেখা তাঁর সেই বিখ্যাত $E = mc^2$ সমীকরণেও।

তত্ত্ব (Theory) বাস্তবকে ব্যাখ্যা করার জন্য, না বাস্তব তত্ত্বকে ব্যাখ্যা করার জন্য ; আমার ব্যক্তিগত ধারণা তত্ত্ব বাস্তবকে ব্যাখ্যা করার জন্য। 'যদি কোন কণা আলোর চেয়ে বেশি গতিবেগে চলে তাহলে স্পষ্টই সময়ের বিপরীত দিকে যাবে'—উক্ত বাক্যবন্ধটি সৌমিত দাসেরই লেখা। আমার মনে হয় কখনই, যত বেশি দ্রুতগামী বস্তু হোক না কেন, তা সময়ের বিপরীতে যেতে পারে না। যদি তাই হয়, তাহলে আইনস্টাইনের সমীকরণটি ধ্রুবসত্য নয়।

যদি ধরে নেওয়া যায় ট্যাকিওনের অস্তিত্ব আছে তবে একথা নিশ্চিত করে বলা যাবে না যে ট্যাকিওনের গতিবেগই অসীম মহাকাশের সর্বোচ্চ গতিশীল কণা কিনা।

সৌমিত দাসের প্রবন্ধে লেখা "মিঃ হুইলার 'সুপার স্পেস' বা বহির্মহাবিশ্বের একটি কাঠামো তৈরি করেন। এই বিশ্বে সময় এবং আলোর গতি, দুইয়েরই মান হারিয়ে যায়।" এই অংশটি যথেষ্ট গ্রহণ যোগ্য, আমার ব্যক্তিগত ধারণা এটি সঠিক। আমার ব্যক্তিগত ধারণা অনুযায়ী 'ট্যাকিওন' যদি আবিষ্কৃত হয় তাহলে তার নিম্নলিখিত বৈশিষ্ট্যগুলি থাকতে পারে।

1. ট্যাকিওন একটি ভরহীন কণা, গতিবেগ অসীম।

2. এটি সম্ভবতঃ স্বচ্ছ হবে।

3. এটি নিউট্রাল, তবে নাও হতে পারে।

4. এর অবস্থা পদার্থ ও শক্তির মাঝামাঝি। অর্থাৎ পদার্থ যখন শক্তিতে বা শক্তি যখন পদার্থে পরিণত হতে চলেছে সেই রকম অবস্থা।

5. আমার মনে হয় আমাদের বাস্তব মৌলগুলি প্রত্যেকটির মধ্যেই ট্যাকিওনের অস্তিত্ব রয়েছে।

6. কোন একটি যৌগে, তার অন্তঃস্থিত মৌলগুলির মধ্যেকার 'ট্যাকিওন' ট্যাকিওনের গতিতে সমগ্র যৌগটির প্রতিটি অংশের মধ্যে সংযোগ সাধন করে যৌগটির একটি স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য গড়ে তোলে।

7. ট্যাকিওন কণাটি কোন একটি মৌলকে পদার্থে অথবা শক্তিতে রূপান্তর করার সময় সার্বিক ভূমিকা নেয়।

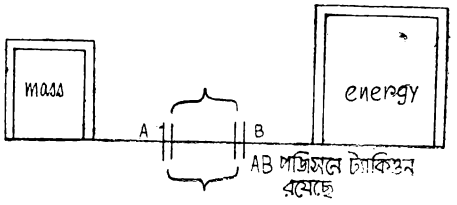

8. আমার মনে হয় যদি কোন উপায়ে মৌল থেকে ট্যাকিওনকে পৃথক করা যায় তাহলে ট্যাকিওন নিজস্ব গতি লাভ করে এবং অপর কোন মৌলের ভিতর নিজের আবাস খুঁজে নেয়।

9. মৌলের ইলেকট্রনের দুটি কক্ষপথের মাঝখানে, নিউক্লিয়াস, প্রোটন, নিউট্রন, পজিট্রন ইত্যাদির ফাঁকে রয়েছে ট্যাকিওন।

10. মহাবিশ্বে শূন্যস্থান বলে কিছু নেই। আমরা যেটিকে শূন্যস্থান বলে মনে করি হয়ত সেখানেও রয়েছে ট্যাকিওনের মত কণা।

11. দুটি মৌলের মধ্যে বিক্রিয়ায় প্রথমে উত্তেজিত হয় ট্যাকিওন।

12. ট্যাকিওনের গতি সরল রেখায় হবে।

পাঠকগণ উত্তেজিত হবেন না। প্রথমেই বলে নিয়েছি আমার সমস্ত ধারণাই কাল্পনিক। আমার প্রবন্ধে যুক্তির চেয়ে অনুমান বেশী।

রায় পাড়া, কৃষ্ণনগর, নদীয়া।

ব্যাটারির সাহায্যে লেখা

সুজন পাল

ব্যাটারির সাহায্যে নাম লেখা যায় কি কাগজের উপরে ? হাঁ যায়। কিভাবে যায় তা তোমাদের পরে বলছি। আগে যেই জিনিসগুলি দরকার সেইগুলি যোগাড় করে ফেল। (1) পটাসিয়াম আইওডাইড (K1) (2) 6Volt ব্যাটারি, (3) 5ইঞ্চি চৌক ব্লটিং পেপার (4) একটি স্টিলের ছোট থালা। (5) কিছু ময়দা এবং একখণ্ড চকচকে লোহার মোটা তার।

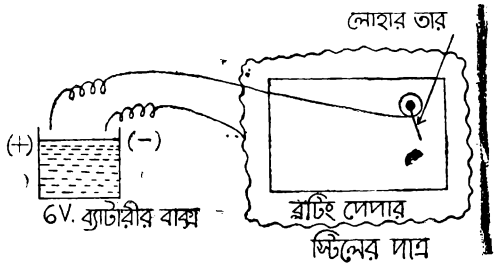

পটাসিয়াম আইওডাইড (K1) স্কুলের রাসায়নাগরে অথবা যে সমস্ত দোকানে রাসায়নিক পদার্থ বিক্রয় হয়, সেই দোকানে পেয়ে যাবে। আর বাকি জিনিসগুলি কোথায় পাবে তা তোমরা জান।

এবার বলি কিভাবে করবে—প্রথমে চা চামচের দুই চামচ ময়দা এবং দেড় চামচ পটাসিয়াম আইওডাইড (K1) কে ভাল ভাবে জল দিয়ে মেখে নাও। লক্ষ্য রাখবে যেন খুব পাতলা না হয়। একটু থকথকে জেলির মত হবে। এবার ব্লটিং পেপারের দুইদিকে মিশ্রণটিকে ভালভাবে মাখিয়ে থালার উপর রাখ। এবং লোহার তারটির ডগাটিকে সরু করে উপরে ব্যাটারির পজেটিভ প্রান্তটাকে জড়াও এবং থালায় নেগেটিভ প্রান্তটিকে রেখে লোহার তারটি দিয়ে কাগজের উপর আস্তে আস্তে লিখতে থাক দেখবে বাদামী রঙের লেখা ফুটে উঠেছে।

64, বড়বাগান লেন, শ্রীরামপুর, হুগলি।

গ্লিসারিনের গুণবিচার

ইন্দ্রনীল বসু

রসায়ন বিজ্ঞানে গ্লিসারিন বা গ্লিসারল একই জিনিস। রসায়নের ভাষায় এ জিনিসটি হচ্ছে একটি 'ট্রাই হাইড্রিক অ্যালকোহল।' সমস্ত প্রকার জৈব তেল বা চর্বি, নারিকেল তেল, সরিষার তেল, মাখন, অলিভ তেল, তিসির তেল ইত্যাদির মধ্যে গ্লিসারিণ মিশ্রিত থাক। গ্লিসারিন বর্ণহীন ও গন্ধহীন এবং মিষ্টি সিরাপের ন্যায় ঘন একটি জৈব তরল।

তেল বা চর্বিকে কস্টিক সোডা দ্রবন সহযোগে উত্তপ্ত করলে (আর্দ্র বিশ্লেষিত করলে) তেল বা চর্বি বিয়োজিত হয়ে গিয়ে সাবান এবং গ্লিসারিন উৎপন্ন করে।

সাবানটিকে সরিয়ে নিলে যে তরল পদার্থ পড়ে থাকে, তার নাম স্পেন্ট লাই (Spent lye)। এতে গ্লিসারিনের লঘু জলীয় দ্রবন খুব বেশী থাকে না, মাত্র 5%—8% থাকে। সোডিয়াম ক্লোরাইড, কস্টিক সোডা, চর্বি প্রোটিন জাতীয় পদার্থ এর মধ্যে থাকে। স্পেন্ট লাইকে অ্যাসিড দ্বারা প্রসমিত করে অ্যালুমিনিয়াম সালফেট যোগ করলে কতক-গুলি দ্রব্য পৃথক হয়ে পড়ে। ফিল্টার করে পরিস্রুতকে নিম্নচাপে বাষ্পায়িত করে গাঢ় করলে সাধারণ লবন পৃথক হয়ে যায় এবং মোটামুটি গাঢ় গ্লিসারিন (83%) পাওয়া যায়। একে সক্রিয় চারকোল দ্বারা পরিস্কার করে নিম্নচাপে অতি উত্তপ্ত স্টিমের মধ্যে পাতিত করা হয়। তারপর বায়ু শূন্য পাত্রে গাঢ় করে প্রায় 99% বিশুদ্ধ গ্লিসারিন পাওয়া যায়। এতো গেল গ্লিসারিনের প্রস্তুতি প্রণালী। এবারে আসা যাক তার গুণাবলীর কথায়। বাস্তব-জীবনে গ্লিসারিনের ব্যাবহার অপরিসীম বা দুই এক কথায় বলে শেষ করা যায় না।

নাইট্রো গ্লিসারিন নামক বিস্ফোরক প্রস্তুতিতে প্রচুর পরিমানে গ্লিসারিন লাগে। আবার নাইট্রো গ্লিসারিন থেকে তৈরী করা হয় 'ডিনামাইট' নামক প্রচণ্ড বিস্ফোরক পদার্থ। যার আবিষ্কারক বিজ্ঞানী অ্যালফ্রেড বার্নার্ড নোবেল। এই জগৎ বিখ্যাত বিজ্ঞানীর নাম তোমরা অবশ্যই শুনে থাকবে। অ্যালকিড জাতীয় প্লাস্টিক, ছাপার কালি, কপিইং কালি ইত্যাদি তৈরী করতে গ্লিসারিন দরকার হয়। রবার, চামড়া, সুতি শিল্প, খাদ্য সংরক্ষণ, প্রসাধন ও ঔষধ তৈরী করতেও গ্লিসারিণের অবাধ স্পর্শ।

গ্রাঃ-শিশ্বাস পাড়া, পোঃ-বালুরঘাট, পশ্চিম দিনাজপুর।

হাতে কলমে আধ ডজন

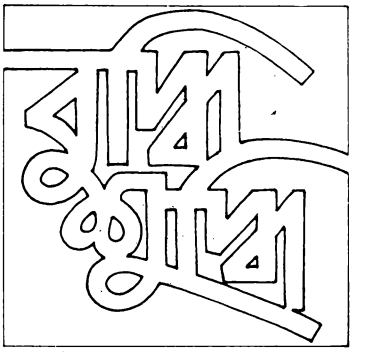

লেখা ও ছবি : সমীর মণ্ডল

এবারে আধডজন সমস্যা দিচ্ছি। এর সমাধান করতে হাতে-কলমে তোমরা তা করে দেখতে পারো। আবার শুধু চিন্তা ভাবনাতে এর সমাধান সূত্র পেয়ে যেতে পারো। আমি চাই নিজেরা করে দেখে ঠিক ঠিক মজাটা পাও।

(1) দুটো দড়ি ঝুলছে ওপর থেকে দূরে দূরে। দুটো দড়ির মুখ এক জায়গায় করতে পারলে তুমি গিট বেঁধে দিতে পারো। কিন্তু একটিকে ধরে এগিয়ে গিয়ে অন্যটা ছুঁতে পারছ না। তোমার কাছে একটি বড়ো কাঁচি আছে। তার সাহায্যে কিভাবে দুটো দড়ি বাঁধতে পারো ?

(2) মেজেতে পাতা কম্বলের ঠিক মাঝখানে তেল ভর্তি একটি বোতল রাখা আছে। বোতলে হাত না লাগিয়ে কিভাবে তুমি বোতলটিকে কম্বলের বাইরে আনবে ?

(3) খবরের কাগজের চারভাগের এক ভাগ নাও। সেটা মেজেতে পেতে তার ওপর দুবন্ধু পাশাপাশি দাঁড়াও। একটা শর্ত—কেউ কাউকে ছুঁতে পারবে না।

(4) একটি বল কেমনভাবে ছুঁড়লে তা কিছুদূর গিয়ে একদম থেমে গিয়ে আবার তোমার কাছে ফিরে আসবে ?

(5) দুমিটার লম্বা দড়িতে একটি কাপ ঝোলানো আছে। দড়িটার মাঝখানে কাটো। কাপ কিন্তু মাটিতে পড়বে না। কেউ ধরবেও না।

(6) কাঠের মাঝখানে একটি 20 সেমি. লম্বা 5 সেমি. চওড়া গর্ত আছে। তোমার কাছে একটিমাত্র 50 মিমি. ব্যাসের লম্বা কাঠের রড আছে আর আছে করাত। কিভাবে ঐ গর্ত ভরাট করবে ?

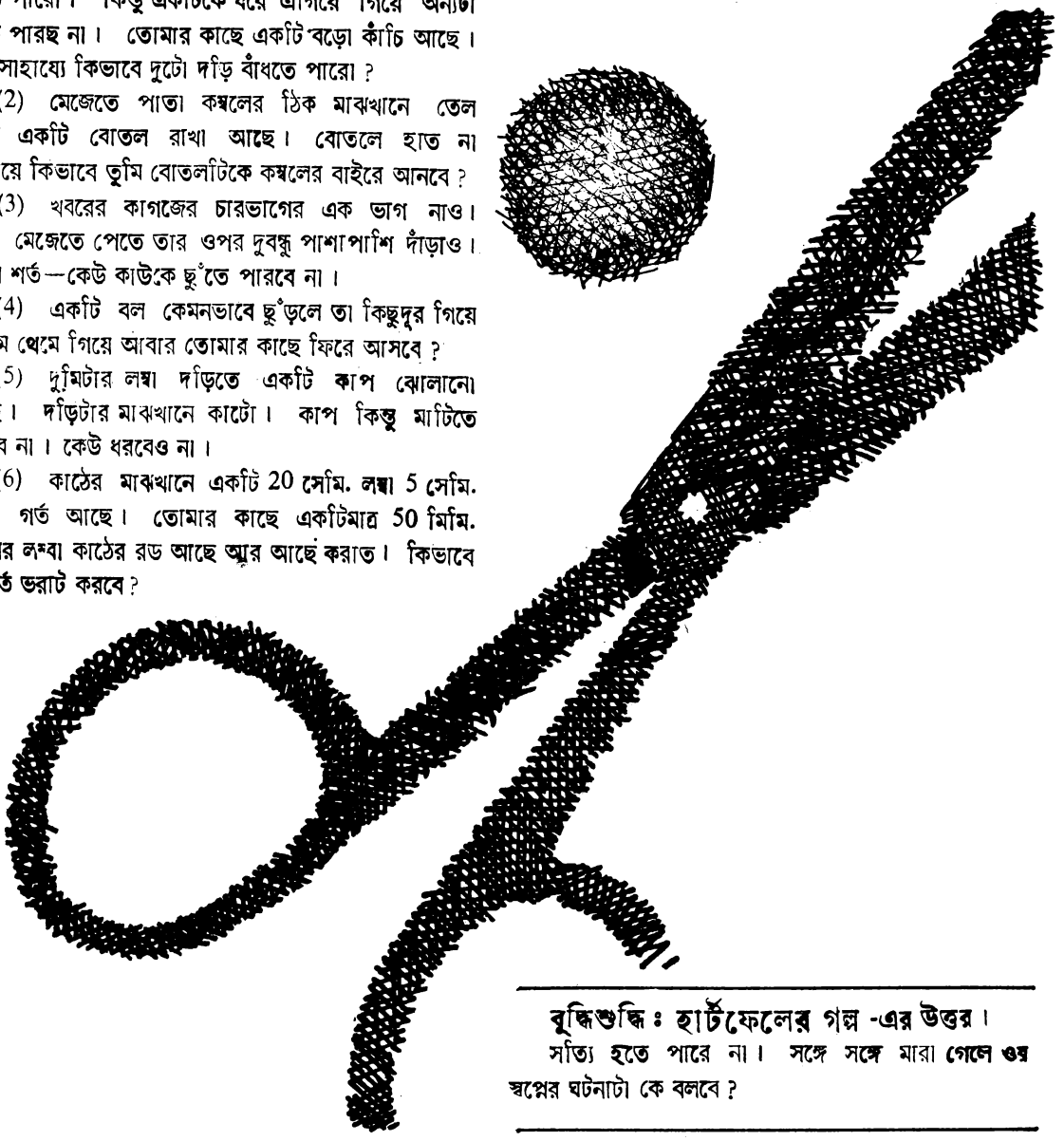

বুদ্ধিশুদ্ধি : হার্টফেলের গল্প -এর উত্তর।

সত্যি হতে পারে না। সঙ্গে সঙ্গে মারা গেলে ওর স্বপ্নের ঘটনাটা কে বলবে ?

তারামাছ

শৈবালকুমার গুহ

সমুদ্রের তলদেশে একরকম প্রাণী বাস করে, যা দেখতে একটা তারার মতো। তাই সাধারণ লোকে এদেরকে বলে তারামাছ। ইংরাজীতে বলা হয় স্টারফিস (Star fish) এরা কিন্তু মোটেই মাছ নয়—ফাইলাম একাই-নোডার্মাটা বা কণ্টকত্বক শ্রেণীর অন্তর্গত একপ্রকার অমেরুদণ্ডী প্রাণী।

তারামাছের দেহটি ঠিক যেন একটি তারার মতো, দেহের মধ্যভাগ থেকে পাঁচটি বাহু পাঁচদিকে প্রসারিত। এদের দেহ অরীয় ভাবে প্রতিসম (radially symmetrical)। দেহের মধ্যভাগকে কেন্দ্র করলে এটি পাঁচটি ব্যাসার্ধ বরাবর প্রসারিত। ঐ কেন্দ্রের মধ্য দিয়ে, এদের দেহকে যে কোন ব্যাস বরাবর দু'ভাগে ভাগ করলে, একই রকম দুটি খণ্ড পাওয়া যাবে। এদের দেহের উপরিভাগ সূচের মতো কাঁটা দ্বারা আবৃত। ঐসব কাঁটার নীচে সাঁড়াশির (pincer) মতো ছোট ছোট অঙ্গ থাকে। তারা-মাছ যদি হঠাৎ কখনও কোনো সামুদ্রিক উদ্ভিদের গায়ে আটকে যায়, তাহলে এদের সাহায্যে সামুদ্রিক উদ্ভিদকে কেটে ফেলে তারামাছ নিজেকে মুক্ত করে ফেলতে পারে। তারা মাছের দেহ ছোট ছোট শক্ত খোলা দিয়ে ঢাকা থাকে। দেহের মধ্য ভাগের নীচের দিকে থাকে মুখ, এর ঠিক বিপরীত দিকে, অর্থাৎ উপরের দিকে পায়ুছিদ্র। পায়ু-ছিদ্রের অল্পদূরেই একটি বহুছিদ্রযুক্ত চাকতি অবস্থিত। এই চাকতিকে ঘিরে থাকে সুতোর মতো অনেক নার্ভ। এই নার্ভ প্রতিটি বাহুর অগ্রভাগ পর্যন্ত প্রসারিত। তবে তারা মাছের নার্ভতন্ত্র বিশেষ উন্নত নয়।

এর দেহের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হল, অসংখ্য জলনালী নিয়ে গঠিত জলসংবহন তন্ত্র (water uascular system)। তারা মাছের দেহের উপরের দিকে, মধ্য-ভাগের কাছে, একটি ক্ষুদ্র ছিদ্র আছে, যাকে মেড্রিপোর (Madrepore) বলে। এটি একটি ভালভের মতো কাজ করে, এবং নীচের গোলাকার জলনালীতে (ring canal) জল-সরবরাহ নিয়ন্ত্রিত করে। দেহের উপরি ভাগে অবস্থিত মেড্রিপোর থেকে শুরু করে এই নালীগুলো মুখের চারদিকে বৃত্তাকারে এবং প্রতিটি ব্যাসার্ধে লম্বালম্বিভাবে অবস্থিত। প্রতিটি লম্বানালীর সঙ্গে অসংখ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নলের সংযোগ আছে। এইরূপ নলের নাম নলপদ (tube foot)। এগুলি দেহের নীচের অংশে সারিবদ্ধভাবে সজ্জিত থাকে। জলসংবহনতন্ত্রের সাহায্যে জল-প্রবাহের গতিবেগ নিয়ন্ত্রিত হয়, এবং প্রয়োজনমত নলগুলি সংকুচিত ও প্রসারিত হয়। নলপদ ও তৎসংলগ্ন পেশীর সাহায্যে তারা-মাছ অনায়াসে চলাফেরা এবং খাদ্য সংগ্রহ করতে পারে।

কণ্টকত্বক প্রাণীদের মধ্যে এরাই সবচেয়ে দ্রুত। মাঝে মাঝে তারা-মাছকে গভীর সমুদ্রের তলদেশে ছোট গর্তে বাহু-গুলিকে গুটিয়ে নিয়ে বিশ্রাম নিতে দেখা যায়। এদের বাহুর মধ্যে অবস্থিত চোষকের (sucker) সাহায্যে এরা সমুদ্রের তলদেশে কঠিন বস্তুর উপর আটকে থাকে। ডুবুরীরা যদি এদের জোর করে উল্টে দেয়, তবে এরা বাহুর সাহায্যে ডিগবাজি খেয়ে আবার সঠিক অবস্থানে ফিরে যেতে পারে।

তারা-মাছ মাংসাশী এবং দক্ষশিকারী। এদের খাদ্য প্রধানতঃ শামুক, ঝিনুক প্রভৃতি প্রাণী। তারা-মাছের খাদ্যসংগ্রহের পদ্ধতি খুবই বৈশিষ্ট্যপূর্ণ। এরা নলপদের সাহায্যে চাপ দিয়ে ঝিনুকের শক্ত খোলা খুলে ফেলে নিজের পাকস্থলীটি বের করে ঝিনুকের মাংসল দেহের উপর বিছিয়ে দেয় এই সময় এদের মুখ দিয়ে একপ্রকার রস নিঃসৃত হয়। কিছুক্ষণ পরে সে নিষ্পেষিত ঝিনুকের মাংসসহ পাকস্থলীটি আবার নিজের শরীরের মধ্যে ঢুকিয়ে নেয়। ঝিনুকের খোলাটি বাইরে পড়ে থাকে। তারা-মাছের দেহের চারদিকে ভোঁতা কাঁটার মতো পেডিসিলারিই (pedicillariae) নামক আর এক প্রকার অঙ্গ দেখা যায়। এগুলি চোয়ালযুক্ত সাঁড়াশির মতো। ছোট ছোট প্রাণীরা যদি তারা মাছের দেহের সংস্পর্শে আসে, তাহলে তারা-মাছ এদের সাহায্যে তাদের নিষ্পেষিত করে খাদ্যে পরিণত করে নেয়।

এদের দেহের পুনর্গঠন ক্ষমতা অসাধারণ। দৈবাৎ কোনো বাহু দেহচ্যুত হলে, দেহচ্যুত বাহু থেকেই দেহের মধ্যভাগ ও অবশিষ্ট চারটে বাহু পুনর্গঠিত হয়। অর্থাৎ ঐ বাহু থেকেই একটি সম্পূর্ণ তারা-মাছ তৈরি হয়ে যায়। আবার, একটা, দুটো এমনকি চারটে বাহু পর্যন্ত বিনষ্ট হলে, অথবা ভেঙ্গে গেলে, তাও পুনর্গঠিত হতে পারে। অর্থাৎ, বিকলাঙ্গ তারামাছও তার পরিত্যক্ত অঙ্গটি ফিরে পায়। একবার এক মুক্তা ঝিনুক-শিকারী একটি তারা-মাছকে কেটে দু'টুকরো করেন। কয়েকদিন পরে তিনি অবাক হয়ে দেখলেন, প্রতিটি খণ্ড থেকে একটি ক'রে নতুন তারামাছ গঠিত হ'ল। আগেকার দিনে জেলেদের জালে তারা মাছ ধরা পড়লে,

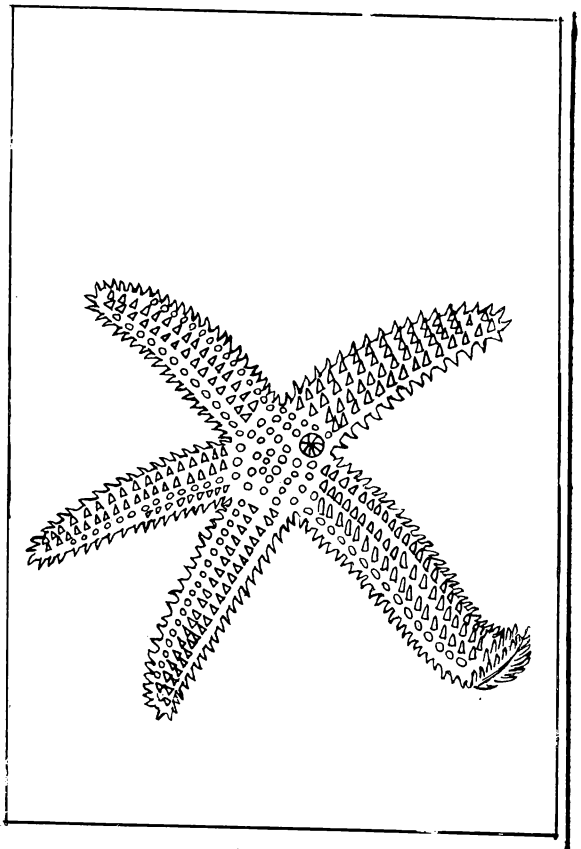

তারা-তারা-মাছকে কেটে দু'টুকরো করে আবার সমুদ্রের জলেই ফেলে দিত। কিন্তু এর ফলে এদের সংখ্যা কমা তো দূরের কথা, বরং বেড়ে যেত। এদের দেহ পুনর্গঠনের প্রকৃতিদত্ত ক্ষমতা দেখলে সত্যি অবাক হতে হয়।

পৃথিবীর নানা সমুদ্রে তারা-মাছ দেখা যায়। এদের অসংখ্য প্রজাতি আছে। এদের বাহুসংখ্যা সাধারণতঃ পাঁচ, কিন্তু একপ্রকার লাল-সাদা তারা-মাছে ছয়টি বাহু দেখা যায়। বিভিন্ন তারা-মাছের আকারে, কারুকার্যে এবং রঙে নানা বৈচিত্র্য দেখা যায়। প্রশান্ত মহাসাগরে লাল তারা-মাছ দেখা যায়। অতলান্তিক মহাসাগরে লাল, কমলা, হলুদ প্রভৃতি রঙের তারা-মাছের দেখা মেলে। লাল তারা-মাছ-গুলি আকৃতিতে ছোট, এবং দেহ সূক্ষ্ম কাঁটায় আবৃত। অতলান্তিক মহাসাগরের গভীর সমুদ্রের তলদেশে এক প্রকার গোলাপী তারা-মাছ দেখা যায়, যাদের দেহ চিত্র-বিচিত্র। গভীর সমুদ্রের তলদেশে এইরূপ নানা রঙের তারা-মাছকে পড়ে থাকতে দেখলে, মনে হয়, সমুদ্রের গালিচায় অতিথিদের বসবার জন্য কেউ বুঝি নানারঙের কতকগুলি কুশনের গদি সাজিয়ে রেখেছে।

প্রমত্নে ডঃ মৃত্যুঞ্জয় প্রসাদ গুহ, 5/3A, ওলাইচণ্ডী রোড, কলিকাতা-700037।

মাছের বিচিত্র গল্প

বরুণ মজুমদার

বহুরূপী গিরগিটির কথা আমরা জানি। এইসব গিরগিটি যখন যে গাছে থাকে তখন সেই গাছের রঙের মত তার গায়ের রঙ হয়ে যায়। সুতরাং রঙ বদলের খেলায় তাদের জুড়ি নেই। অবশ্য শিকার ধরার জন্য তারা এভাবে গায়ের রঙ পাল্টায়। আবার লাউডগা সাপ গাছের সবুজ অংশের সঙ্গে এমনভাবে মিলিয়ে থাকে যে, অনেক সময় ঐ সাপকে চিনে নিতে ভুল হয়।

আমরা অনেকে বাড়ীতে শখ করে রঙিন মাছ পুষে থাকি। তাদের গায়ের রঙের বৈচিত্র্য আমাদের মুগ্ধ করে। কিন্তু তাদের গায়ের রঙ বড় একটা পাল্টায় না। অথচ সমুদ্রের বুকে এমন ধরণের মাছ আছে, যারা ঘন ঘন গায়ের রঙ বদলাতে পারে। ফাইল ফিস নামে এই ধরণের মাছ সমুদ্রের তলদেশে যখন যে পরিবেশে থাকে তখন সেই পরিবেশের সঙ্গে এক করে গায়ের রঙ ধারণ করে। সমুদ্রের তলায় যে সমস্ত লতাপাতা বা শেকড় থাকে তার সঙ্গে রঙ মিলিয়ে এক হয়ে এমনভাবে এই মাছগুলো থাকে যে, কারো পক্ষে তাদের খুঁজে পাওয়া মুস্কিল। অবশ্য এরা শিকার ধরার জন্য এরকম রঙ বদলায় না। আসলে শত্রুর হাত থেকে বাঁচার জন্য অর্থাৎ শত্রু যাতে তাদের খোঁজ না পায় তার জন্যই এই রঙ বদলের পালা চলে।

সমুদ্রে রঙ বদলানো মাছ যেমন আছে, তেমনি আছে আলোজ্বালা মাছ। গভীর সমুদ্রের তলদেশে যে সব ডুবুরী নেমেছেন, তাঁরা দেখেছেন, সমুদ্রের তলদেশে তারা-নক্ষত্রের মতো নীলাভ সবুজ রঙের আশ্চর্য্যজনক আকার বিন্দু। তাহলে কি পৃথিবীর ওপরে আকাশের মত সমুদ্রের তলদেশে আছে অনন্ত মহাকাশ? আর সেই মহাকাশে মিট মিট করে জ্বলছে অসংখ্য তারা বা নক্ষত্র? এসব প্রশ্ন জাগাটা খুব স্বাভাবিক। বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই মাছেদের শরীরেই আলো উৎপন্ন হয়ে থাকে। সাধারণতঃ সমুদ্র জলের উপরিতল থেকে দেড় হাজার ফুটের বেশি নীচে সূর্য্যের আলো প্রবেশ করতে পারে না। এর নিচে সমুদ্রের জলের মধ্যে গাঢ় অন্ধকার। আর এই অঞ্চলেই আলোকবাহী মাছেদের বাস। আলো জ্বালাবার জন্য এদের কোনো আগুন বা তেলের প্রয়োজন হয় না। প্রয়োজন হয় না বিদ্যুতের। সমুদ্রের জলে যে সব মাছ আলো জ্বেলে চলে তার মধ্যে সবচেয়ে উজ্জ্বল আলোর অধিকারী হল ফোটোব্লেফারেন মাছ। অবশ্য এই নামটা এদের বৈজ্ঞানিক নাম। চলতি কথায় এদের বলা হয় ফ্ল্যাশলাইট মাছ। এদের আলোটা থাকে চোখের নিচে ফোটোফোর নামে জায়গাতে। আর ঐ জায়গাটাতে থাকে অসংখ্য ব্যাক্টিরিয়া। এই ব্যাক্টিরিয়ার সংখ্যা 1 লক্ষ পর্যন্ত

হতে পারে। মাছগুলোর দেহের তন্তু খেয়ে ব্যাক্টিরিয়াগুলো বেঁচে থাকে। মাছের রক্ত থেকে চিনি ও অক্সিজেন টেনে নিয়ে রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় ঐ ব্যক্টিরিয়াগুলো আলো সৃষ্টি করে। ব্যাক্টিরিয়াগুলোর গা থেকে আলো বের হয়। আর এই আলো দূর থেকে অর্দ্ধচন্দ্রাকারের মত দেখায়। জৈব রাসায়নিক শক্তিটা আলোয় পরিণত হয়। এত উজ্জ্বল আলোতে মাছের চোখ ধাঁধিয়ে যায় না কি? এই প্রশ্নটা স্বাভাবিক। না, তার জন্য ঐ আলোর জায়গায় চারদিকে আছে কালো চামড়ার আস্তরণ। এই কালো চামড়ার আস্তরণ

ইচ্ছেমত মাছ প্রসারিত করতে বা গুটিয়ে নিতে পারে। ঐ চামড়া দিয়ে আলো ঢেকে দিলে মনে হবে আলো নিভে গেছে। শত্রু পিছু ধাওয়া করলে ফ্ল্যাশলাইট মাছ চোখের নিচের পর্দা প্রসারিত করে দপ করে আলো নিভিয়ে চোরা-গোপ্তা পথে চলে যায় অন্য যায়গায় আবার হয়ত শত্রুর সামনে এসে দপ করে আলো জ্বালিয়ে দেয়। শত্রু দিশাহারা হয়ে পড়ে। আত্মরক্ষার জন্য তাদের এই বিচিত্র পদ্ধতির নাম দেওয়া হয়েছে 'ব্লিংক এ্যাণ্ড রান'। এই আলো থাকার জন্য মাছগুলো খাদ্য খুঁজে খেতে পারে। সাধারণতঃ তিন ইঞ্চির মতো লম্বা এই মাছগুলোর খাদ্য হল ক্রীস্টোজিয়াম প্রাণী। তাই বলে এই ফ্ল্যাশলাইট মাছগুলো মোটেই হিংস্র নয়। অথচ এদের চারপাশে থাকে অজস্র হিংস্র জাতের মাছ ও অন্য সামুদ্রিক জন্তু। এই সামুদ্রিক জন্তুদের মধ্যে লম্বা শিরদাঁড়া-ওয়ালা ডায়াডিমার ফ্ল্যাশলাইট মাছদের খুবই উত্যক্ত করে। আবার স্করপিয়ন মাছ, লায়ন মাছে মত পিঠের পাখনায় বিষওয়ালা মাছ এদের চারদিকে থাকে। এত শত্রু পরিবেষ্ঠিত হয়েও নেহাৎ ঐ আলোর কসরতের জোরে ফ্লাশলাইট মাছেরা দিব্যি জীবন কাটায়, লোহিত সাগরের উত্তর ভাগে এবং ইন্দ্রনেশিয়া থেকে পশ্চিমে কোমোরো দ্বীপ পর্য্যন্ত প্রায় 6 হাজার মাইল সমুদ্র অঞ্চল জুড়ে এই বিস্ময়কর মাছেদের বাস। সাধারণ অবস্থায় এই মাছগুলি মিনিটে দু তিনবার আলোর ওপর আবরণ ফেলে দেয়। কিন্তু বিপদের সময় মিনিটে 75 বার পর্য্যন্ত আলো জ্বালাতে নেভাতে পারে। মরে যাবার পর বেশ কয়েক ঘণ্টা আলো জ্বলে থাকে।

আলোর অধিকারী শুধু ফ্ল্যাশলাইট মাছই নয়, সমুদ্রের নিচে বসবাসকারী আরো কিছু মাছ আছে যাদের দেহে আলো আছে। ল্যাণ্টার্ন ফিশ নামে এক ধরনের মাছের দেহে থাকে লুসিফারিন। এই ধরনের মাছের গায়ের নিচে আছে এক ধরনের লালাগ্রন্থি। সারি দেওয়া লালাগ্রন্থির পেছনে থাকে ছোট্ট একটু ছিদ্র আর সামনে থাকে লেন্সের মত বস্তু। ঐ ছিদ্রের মধ্যে তৈরি হয় আলো। ছিদ্রের একেবারে নিচের দিকে পাতলা ঝলমলে এক জিনিষ আলো প্রতিফলনের কাজ করে। আর এ থেকে উজ্জ্বল আলো ছড়িয়ে পড়ে।

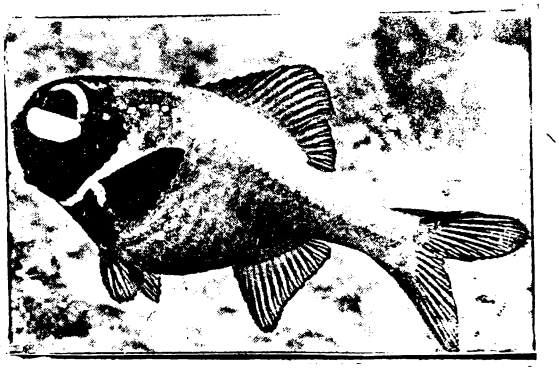

র‍্যাটটেল নামে এক রকমের মাছের দেহে আলো সৃষ্টি হয়। কিন্তু সচরাচর তারা এই আলো ব্যবহার করে না। শত্রু এলে আত্মরক্ষার জন্য তারা ঐ আলো ব্যবহার করে।

আলোর অধিকারী আর এক ধরনের মাছ আছে গভীর সমুদ্রে। এদের নাম এ্যাংলার ফিশ। এদের নাকের ওপরে থাকে আলো। এই আলো তাদের তৈরি। নাকের ওপরের ঐ আলোর সাহায্যে এরা শিকার ধরে খায়। তাই ঐ আলো বলতে গেলে খাবার খোঁজার আলো। যাই হোক না কেন, আলো জ্বালা মাছেদের জগৎ সত্যিই বিচিত্র জগৎ। এরাও আমাদের পৃথিবীর বিস্ময়।

রঙীন মাছের কথা আমরা যেমন জেনেছি, আলো জ্বালা মাছের কথা যেমন শুনেছি, তেমনি আরো নানা ধরনের মজার আশ্চর্যজনক মাছ আছে সমুদ্রের জলে। এক ধরনের নানান উজ্জ্বল রঙের মাছ আছে, যাদের নাম প্যারট ফিস। টিয়া পাখীর ঠোঁটের মত এদের দুপাটি ধারালো দাঁত আছে, তাই এদের এই নামকরণ হয়েছে।

বৈদ্যুতিক মাছের কথা শুনলে অবাক হয়ে যেতে হয়। এ পর্যন্ত প্রায় দেড়শো রকমের মাছের সন্ধান পাওয়া গেছে যাদের শরীরে বিদ্যুৎ উৎপাদন হয়ে থাকে। বৈদ্যুতিক শক দিয়ে শত্রুকে অসাড় করে দেওয়া বা শিকার ধরার জন্য এরা তাদের ঐ বিচিত্র ক্ষমতাকে কাজে লাগায়। ইলেকট্রিক ঈল মাছ বৈদ্যুতিক মাছের মধ্যে সবচেয়ে বেশি বিদ্যুৎ উৎপাদন করতে পারে তাদের শরীরে। এই বৈদ্যুতিক ব্যবস্থা ব্যাটারী চালিত মোটরের মত। এই জাতের মাছ গড়পড়তা 4শো ভোল্ট 1 অ্যাম্পীয়ার বিদ্যুৎ উৎপাদন করতে পারে। এর বেশি অর্থাৎ সর্বাধিক সাড়ে 6শো ভোল্ট বিদ্যুৎ উৎপাদন করার ক্ষমতাও কোনো কোনো মাছের আছে। যে সব মাছ তাদের শরীরে বিদ্যুৎ উৎপাদন করতে পারে তাদের মধ্যে ইলেকট্রিক ক্যাট ফিশ বাংলায় যাকে বলা হয় বৈদ্যুতিক বিড়াল মাছ, টর্পেডো প্রভৃতির নাম উল্লেখ-যোগ্য। ইলেকট্রিক ঈলকে বাংলায় বৈদ্যুতিক বাণ মাছও বলা হয়। কলম্বিয়া, ব্রাজিল, পেরু ও ভেনিজুয়েলার সমুদ্রে এইসব মাছ দেখা যায়।

140, রামকৃষ্ণপুর লেন, হাওড়া-2

কেমন করে মুক্তি পাব

সমীর কুমার ঘোষ

'কেমন করে মুক্তি পাব' ?—না, কোন অসুখ-বিসুখ বা কোন সংক্রমণের হাত থেকে নয়। আমাদের সকলেরই বাস্তব অভিজ্ঞতা আছে যে, কোন জিনিসকে উপরের দিকে ছুঁড়ে দিলে, সেই জিনিসটি আবার পৃথিবীর দিকেই ফিরে আসবে। এই ফিরে আসার কারণ হ'ল জিনিসটির উপর পৃথিবীর আকর্ষণ, যাকে বলা হয় 'অভিকর্ষ'। কিন্তু কেমন করে পৃথিবীর এই আকর্ষণ থেকে মুক্তি পেয়ে মহাশূন্যে বার হওয়া যায়, সেটাই হ'ল এই আলোচনার বিষয়বস্তু।

সাধারণ বেগে পৃথিবীর থেকে যে কোন জিনিসকে উপরের দিকে ছুঁড়ে দিলে, অভিকর্ষজনিত আকর্ষণের ফলে, সেই জিনিসটি পৃথিবীর বুকে ফিরে আসবেই। কিন্তু যদি জিনিসটিকে ছোঁড়ার বেগ ক্রমশঃ বাড়ানো যায়, তাহলে এমন একটি বেগ আসবে, যখন সেই বেগে জিনিসটিকে ছুঁড়তে পারলে, সেটি আর পৃথিবীর বুকে ফিরে আসতে পারবে না, অর্থাৎ জিনিসটির পক্ষে পৃথিবীর আকর্ষণ কাটিয়ে ওঠা সম্ভব হবে। বস্তুটির এই বেগকেই বলা হয় 'মুক্তি-বেগ' বা Escape velocity। এখন দেখা যাক যে, m ভরবিশিষ্ট কোন একটি জিনিসের পক্ষে এই মুক্তি-বেগের মান কত হবে।

একটি m ভরবিশিষ্ট জিনিস যখন পৃথিবীপৃষ্ঠে থাকে, তখন তার স্থিতি শক্তির পরিমাণ হ'ল $\frac{GMm}{R}$ এর সমান, যেখানে M ও m যথাক্রমে পৃথিবী ও বস্তুটির ভর, R হল পৃথিবীর ব্যাসার্ধ এবং G হ'ল মহাকর্ষীয় ধ্রুবক (Universal Gravitational constant)। সুতরাং, m ভরবিশিষ্ট ঐ বস্তুটি যদি পৃথিবীর আকর্ষণ কাটিয়ে, পৃথিবী থেকে মুক্তি পেতে চায়, তাহলে তার জন্য প্রয়োজনীয় শক্তির (work) পরিমাণ অবশ্যই তার ঐ স্থিতিশক্তির চেয়ে বেশি হতেই হবে। সুতরাং বস্তুটিকে যদি 3 বেগে উপরদিকে ছোঁড়া হয়, তাহলে তার গতিশক্তির পরিমাণ হবে $\frac{1}{2}mv^2$। এই গতিশক্তির মান যদি বস্তুটির পৃথিবীপৃষ্ঠে থাকাকালীন স্থিতি-শক্তির মানের সমান বা বেশি হয়। তাহলেই বস্তুটি পৃথিবীর আকর্ষণ থেকে মুক্তি পাবে। এখন এই মুক্তি পাওয়ার সময়ে যদি বস্তুটির গতিবেগের মান হয় V_E (মুক্তিবেগ), তাহলে সর্তানুযায়ী $\frac{1}{2}mV_E^2 = \frac{GMm}{R}$ $\therefore$ $VE^2 = \frac{2GM}{R}$।

সুতরাং, পৃথিবীর ভর ও ব্যাসার্ধ এবং G-এর মান থেকে, পৃথিবীপৃষ্ঠে কোন স্থানে কোন বস্তুর মুক্তি-বেগ কত হবে, তা সহজেই নির্ণয় করে ফেলা যায়। পৃথিবীর ভর ও G-এর মান জানা না থাকলেও, অন্য এক সূত্রের সাহায্যে, মুক্তি-বেগের মান নির্ণয় করা যায়।

নিউটনের সূত্র অনুযায়ী। পৃথিবীপৃষ্ঠে অবস্থিত m ভর-বিশিষ্ট একটি বস্তু ও পৃথিবীর মধ্যে আকর্ষণ বলের (F) পরিমাণ হবে $F = \frac{GMm}{R^2}$। এখন যেহেতু $F = mg$ (g—অভিকর্ষীয় ত্বরণ), সেজন্য

$$mg = \frac{GMm}{R^2} \quad \text{বা,} \quad g = \frac{GM}{R^2}$$

বা, $GM/R = gR$.

সুতরাং, মুক্তি-বেগের মান আগে যা পাওয়া গিয়েছে, সেই সমীকরণে $\frac{GM}{R}$ এর পরিবর্তে gR বসাইলে, মুক্তিবেগের মান পাওয়া যায়, $VE^2 = 2gR$। বা, $VE = \sqrt{2gR}$

সুতরাং, পৃথিবীপৃষ্ঠের যে কোন স্থানে, সেই জায়গার g-এর মান ও সেই জায়গায় পৃথিবীর ব্যাসার্ধের মান (R) জানা থাকলে, সেই স্থান থেকে ছোঁড়া কোন বস্তুর মুক্তিবেগ কত হবে, তা সহজেই পাওয়া যায়। প্রসঙ্গত বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য ব্যাপার এই যে, মুক্তিবেগের মান কখনোই বস্তুতে ভরের (m) উপর নির্ভর করে না—অর্থাৎ হাল্কা বা ভারী যে কোন জিনিসের ক্ষেত্রেই, পৃথিবীপৃষ্ঠের এক নির্দিষ্ট স্থান থেকে ছোঁড়া হলে, তাদের মুক্তিবেগের মান একই হবে। কিন্তু যেহেতু, পৃথিবীপৃষ্ঠে পৃথিবীর ব্যাস (R) সর্বত্র সমান নয় (যেহেতু পৃথিবী ঠিক গোলাকার নয়) এবং সর্বত্র পৃথিবী পৃষ্ঠে অভিকর্ষীয় ত্বরণের মানও (g) সমান নয়, সেজন্য, পৃথিবীপৃষ্ঠের বিভিন্ন স্থানে বস্তুর মুক্তিবেগের মান সামান্য হেরফের হবেই। একটি নির্দিষ্ট স্থানে মুক্তিবেগের মান অবশ্যই নির্দিষ্ট। পৃথিবীর গড় ব্যাসার্ধের মান যদি ধরা হয় 6320 কিলোমিটার এবং অভিকর্ষণ ত্বরণের মান যদি ধরা হয় 980 সেমি/বর্গসেকেণ্ড। তাহলে পৃথিবী থেকে কোন বস্তুর মুক্তিবেগের মান দাঁড়াবে,

$$VE = \sqrt{2 \times 980 \times 10^{-5} \times 6320} \text{ কিমি / সেকেণ্ড}$$
$$= 11{\cdot}2 \text{ কিমি / সেকেণ্ড (প্রায়)}$$

এই 11·2 কিমি / সেকেণ্ড-এর অর্থ প্রায় 7 মাইল / সেকেণ্ড বা প্রায় 25000 মাইল / ঘণ্টা। অর্থাৎ পৃথিবীপৃষ্ঠ থেকে কোন বস্তু ছুঁড়ে দিয়ে যদি 'তাকে মুক্তি দিতে চাওয়া হয়, তাহলে তার উৎক্ষেপণ বেগ হ'তে হবে বস্তুতঃ প্রতি ঘণ্টায় 25000 মাইল, সেজন্য পৃথিবী থেকে যত মহাকাশযান মহাকাশে পাঠানো হয়, তাদের সকলের গতিবেগ হওয়া চাই অন্ততঃ ঘণ্টায় 25000 মাইল। কিন্তু এই বিপুল গতিবেগ নিয়ে যখন কোন মহাকাশযান উৎক্ষিপ্ত হয়, তখন বাতাসের ঘর্ষণজনিত এক সমস্যা বিশাল বাধা হ'য়ে দাঁড়ায়। বাতাসের সঙ্গে ঘর্ষণের ফলে, মহাকাশযানটি পুড়ে ছাই হয়ে যাবে। সেজন্য প্রথমে অল্প গতিবেগ দিয়ে, মহাকাশযানটিকে বাতাসের স্তর পার করে দেওয়া হয় এবং তারপরে ক্রমশঃ ধাপে ধাপে তার গতিবেগ বাড়ানো হ'তে থাকে (different stages) এবং সবশেষে সে যখন ঘণ্টায় 25000 মাইল গতিবেগ প্রাপ্ত হয়, তখন সে পৃথিবীর আকর্ষণ থেকে মুক্তি পেয়ে পাড়ি দেয় মহাশূন্যে।

একটা জিনিস জানা দরকার যে, যেহেতু মুক্তিবেগের মান নির্ভর করে g-এর মানের উপর ও R-এর মানের উপর এবং যেহেতু সূর্য বা অন্যান্য গ্রহ-উপগ্রহের প্রত্যেকের ব্যাসার্ধ (R) ও তাদের অভিকর্ষজ ত্বরণের মান (g) ভিন্ন ভিন্ন, সেজন্য প্রত্যেক গ্রহ-উপগ্রহ বা সূর্যের ক্ষেত্রে মুক্তিবেগের মান আলাদা। সূর্য বা অন্যান্য গ্রহ-উপগ্রহদের প্রত্যেকের ক্ষেত্রে তাদের মুক্তিবেগের মান কিরকম হয়, তার একটা ধারণা দেওয়ার জন্য নীচের তালিকাটি দেওয়া হল। এর থেকে প্রত্যেকের মুক্তিবেগ সম্বন্ধে একটা আন্দাজ পাওয়া যাবে।

	গড় ব্যাসার্ধ (R) (কিমি.)	অভিকর্ষজ ত্বরণ (পৃথিবীর তুলনায়)	মুক্তিবেগ (কিমি / সেকেণ্ড)
সূর্য	695300	27	6·20
চন্দ্র	1788	0·17	1·9
বুধ	2500	0·27	3·6
শুক্র	6200	0·86	10·2
পৃথিবী	6320	1·0	11·2
মঙ্গল	3435	0·37	5·1
বৃহস্পতি	69880	2·64	60·0
শনি	57559	1·17	36·0
ইউরেনাস	25500	0·92	21·0
নেপচুন	25000	1·44	23·0
প্লুটো	6350	0·5	11·0

এখন আমরা সহজেই আন্দাজ করতে পারি যে, আমাদের এই পৃথিবী বা অন্য যে কোন গ্রহ-উপগ্রহতেই আমরা থাকি না কেন। পৃথিবী বা সেই গ্রহ-উপগ্রহ থেকে আমরা কেমন করে মুক্তি পাব আর সেই চিরমুক্তির জন্য আমাদের কতখানি গতিবেগ নিয়ে লাফিয়ে উঠতে হবে। সুতরাং, কেমন করে মুক্তি পাব, তার একটা সহজ উপায় আমাদের এখন জানা হয়ে গেল আর সেজন্য এখন আমরা অনেকটা নিশ্চিন্ত — কি বল ?

পদার্থবিদ্যাবিভাগ, বিশ্বভারতী, শান্তিনিকেতন।

জ্যামিতি সমস্যা

নিখিল রঞ্জন বালা

তোমরা তো অনেকেই আজকাল নানান রকম পরীক্ষা দিচ্ছো যেমন, বিজ্ঞান মেধা অনুসন্ধান, অল ইণ্ডিয়া সায়েন্স টিচার্স এসোসিয়েশন ইত্যাদি। কিন্তু এই সব পরীক্ষার প্রশ্নপত্রে মাঝে-মধ্যে জ্যামিতির পাতায় কিছু কিছু প্রশ্ন চোখে পড়ে যা সারাদিন চিন্তা করলেও কৃতকার্য হওয়া যায় না। যেমন, একটি প্রশ্ন ধরা যাক,

দশটি সরলরেখা সর্বাধিক কতগুলি বিন্দুতে ছেদ করবে ?

আমরা তৎক্ষণাৎ খাতা পেনসিল নিয়ে বসি এবং একের পর এক সরলরেখা এঁকে সর্বাধিক বেশী বিন্দুতে ছেদ করাই, কিন্তু এতে সময় লাগে যেমন বেশি তেমনি ভুল হবার সম্ভাবনা থাকে। কিন্তু আমি যে নিয়মটা শিখাবো তাতে যে কোন বড় অঙ্ক যে ধরনের হোক না কেন সহজেই কয়েক মিনিটের ($1-1\frac{1}{2}$) মধ্যে নির্ভুল ভাবে করতে পারবে।

ফর্মূলাটা হল—$^{n}c_{r}$

n = বাহুর সংখ্যা $\dfrac{\underline{|n}}{\underline{|r}\,\underline{|n-r}}$

c = কনসট্যাণ্ট

$$= \frac{\underline{|10}}{\underline{|2}\,\underline{|10-2}}$$

$$= \frac{5\not{1}\not{0} \times 9 \times \underline{|\not{8}}}{\not{2} \times 1 \times \underline{|\not{8}}}$$

= 45টি বিন্দুতে।

তোমরা এখন তোমাদের ভাবে করে দেখতো—কোনটাতে সময় বেশি লাগে, আর কতই নির্ভুল।

সোনারপুর 24-পরগণা (দঃ)।

তরলের নিজস্ব আকৃতি

শ্যামা প্রসাদ কর্মকার

ছোটবেলা থেকে পড়ে আসছি আর শুনে আসছি, তরলের কোন নিজস্ব আকৃতি নেই। কিন্তু যদি বলি তরলের নিজস্ব আকৃতি আছে তবে অনেকেই অবাক হয়ে যাবে, তাই না ?

যে কোন তরলের নিজস্ব আকৃতি স্বাভাবিক ভাবে গোলাকার বা গোলকের মত। কিন্তু অভিকর্ষের জন্য তরল তার এই স্বাভাবিক আকৃতি বজায় রাখতে পারে না। উদাহরণ স্বরূপ বলা যেতে পারে বৃষ্টির ফোঁটার কথা। পতনশীল অবস্থায় বৃষ্টির ফোঁটা গোলাকার, কারণ আমরা জানি পতনশীল বস্তুর কোন ওজন থাকে না অর্থাৎ এক্ষেত্রে অভিকর্ষ ক্রিয়া করে না (বায়ুর প্রতিরোধ এখানে উপেক্ষনীয়)।

কোন পাত্র থেকে মেঝেতে বা অন্য-কোন পাত্রে কোন তরলকে ঢালা হ'লে ঐ তরল মেঝেতে পাতলা স্তরের আকারে ছড়িয়ে পড়ে, অথবা অপর পাত্রের আকার ধারণ করে। কিন্তু কোন তরল যদি তার সমান আপেক্ষিক গুরুত্বের অন্য তরল দ্বারা আবৃত হয় তবে আর্কিমিডিসের সূত্রানুসারে প্রথমোক্ত তরলটি তার ওজন হারায়, অর্থাৎ আপাত ভাবে তার কোন ওজন থাকে না। তখন প্রথমোক্ত তরলের উপর অভিকর্ষ বলের কোন প্রভাব না পড়ায় সেটা স্বাভাবিক গোলকের আকৃতি ধারণ করে। এই ব্যাপারটা প্রমাণ করার জন্য বেলজিয়ান পদার্থবিদ প্লেটো একটা সহজ পরীক্ষা করে ছিলেন। তিনি পরীক্ষা করে দেখিয়েছিলেন যে লঘুকৃত অ্যালকোহলের মধ্যে তেলের একটা ফোঁটা ফেললে তা একটা বিন্দু হিসাবে ঐ অ্যালকোহলের মধ্যে জমা হয় এবং সেটা ডোবেও না আর ভেসেও ওঠে না (একনম্বর ছবি)।

এবার এসো, ঐ রকম একটা পরীক্ষা আমরা করে দেখি ব্যাপারটা ভালো ভাবে বোঝাবার জন্য। আমরা জানি অলিভ অয়েল জলে ভাসে কিন্তু সেটা অ্যালকোহলে ডুবে যায়। কিন্তু আমরা যদি জল আর অ্যালকোহল নির্দিষ্ট পরিমানে মিশিয়ে একটা মিশ্রণ তৈরী করি এবং ড্রপারে করে একফোঁটা অলিভ অয়েল ফেলি তবে দেখতে পাব ঐ ফোঁটাটা মিশ্রনের উপরি তলের কিছুটা নীচে অবস্থান করছে। সেখান থেকে আর ভেসেও উঠছে না বা একেবারে তলিয়েও যাচ্ছে না (এক নম্বর ছবি)। অতএব এই পরীক্ষা থেকে সিদ্ধান্তে আসা যায় যে তরলের নিজস্ব আকৃতি হ'ল গোলকাকার (অবশ্যই অভিকর্ষ বিহীন অবস্থায়।) এই পরীক্ষার ক্ষেত্রে মিশ্রণের মধ্যে অবস্থিত ঐ অলিভ অয়েলের ফোঁটাটা কোন অভিকর্ষ বল অনুভব করে না।

এবার এই পরীক্ষার আর একটা মজার ব্যাপার লক্ষ্য করা যাক। একটা ছোট কার্ডবোর্ডের চাকতিকে তেলে ভিজিয়ে নিয়ে একটা তারের সঙ্গে জুড়েনিয়ে তারপর সেটাকে ঐ মিশ্রণের মধ্যের অলিভ অয়েলের ফোঁটাটার মধ্যে ঢুকিয়ে ঘোরানো শুরু করলে ঐ ফোঁটাটা সংনমিত (Compress) হবে এবং কিছুক্ষণ পরে সেটা একটা বলয়ের আকার ধারণ করবে। বলয়টা টুকরো হয়ে যাবার পরে নতুন ফোঁটা তৈরী হয়ে যাবে অনেক গুলো। আর সেগুলো কেন্দ্রের বড় ফোঁটাটাকে কেন্দ্র করে ঘুরতে থাকবে। এযেন সোলার সিস্টেমের মত ব্যাপার তাইনা ?

তরলের এই ধর্মের উপযোগিতা : অনেকক্ষেত্রে তরলের এই ধর্মকে কাজে লাগানো হয়, অর্থাৎ, 'অভিকর্ষ-বিহীন অবস্থায় তরলের আকৃতি গোলকাকার'—এই ধর্মকে কাজে লাগানো হয়। যেমন—বুলেট তৈরীর করখানায় এই

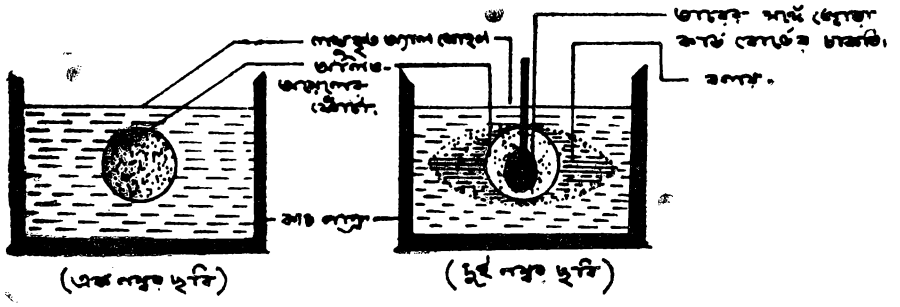

ধর্মকে কাজে লাগিয়েই বুলেটকে গোলাকার করা হয়। বন্দুকের গুলি বা বুলেট আসলে গলিত সীসার জমাট বাঁধা ফোঁটা ছাড়া আর কিছুই নয়। এগুলো তৈরী করার সময় গলিত সীসাকে অনেক উঁচু থেকে ফেলা হয় ঠাণ্ডা জলের

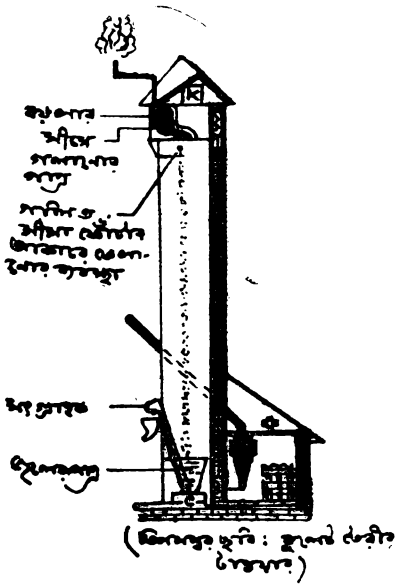

একটা পাত্রে। গুলি বা বুলেট তৈরীর ধাতু-নির্মিত টাওয়ার গুলো 45 মিটার উঁচু হয় আর এগুলোর মাথার উপরে সীসা গলানোর জন্য বয়লার ও গলিত সীসা ছোট ছোট ফোঁটার আকারে ফেলবার ব্যবস্থা করা থাকে। ঐ টাওয়ারের মাথার উপরের গলানো সীসা ফোঁটা ফোঁটা করে ফেলার যন্ত্রের ঠিক নীচেই রাখা থাকে জলের পাত্র। শূন্যের মধ্যে পতনের সময়েই গলিত সীসার ঐ ফোঁটা গুলো গোলাকার হয়ে যায় (যেহেতু পতনশীল বস্তুর কোন ওজন থাকে না) আর জমাট বেঁধে যায়, (তিন নম্বর ছবি)। এবার প্রশ্ন জাগতে পারে সবার মনে, শূণ্যেই যদি জমাট বেঁধে গেল তবে নীচে জলের পাত্র রাখা হয় কেন?—আসলে পতনের আঘাতটা পেয়ে বুলেটগুলো যাতে গোল আকৃতিটা না হারায় তার জন্য। পতনের আঘাতটা কমকরার জন্যই জল রাখা হয়। প্রসঙ্গ-ক্রমে উল্লেখ করা ভলো, শুধুমাত্র 6 মিমির কম ব্যাসযুক্ত বুলেট গুলোকেই এই ভাবে তৈরী করা হয়।

গ্রাম + পোঃ—বেলগ্রাম। জেলা—বর্ধমান (713141)

সংসদের অভিধান গ্রন্থমালা

শৈলেন্দ্র বিশ্বাস সঙ্কলিত,
সুবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত সংশোধিত

- **Samsad English-Bengali Dictionary 65·00**
- **Samsad Bengali-English Dictionary 60·00**
- **Samsad Student's Eng. Beng. Dictionary 27·50**

অঞ্জলি বসু সম্পাদিত

- **Samsad Cmmon words Dictionary Eng.-Beng. 16·50**

গোলোকেন্দু ঘোষ, শিবানী রায় সঙ্কলিত
বীরেন্দ্র মোহন দাশগুপ্ত সংশোধিত

- **Samsad Student's Beng. -Eng. Dictionary 25·00**

জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস সঙ্কলিত

- বাঙ্গালা ভাষার অভিধান

দু'খণ্ডে প্রতি খণ্ড 110·00

শৈলেন্দ্র বিশ্বাস সঙ্কলিত, দীনেশ ভট্টাচার্য সংশোধিত

- সংসদ বাঙ্গালা অভিধান **47·50**

অঞ্জলি বসু সম্পাদিত

- সংসদ বাঙালী চরিতাভিধান **75·00**

অশোক মুখোপাধ্যায় সঙ্কলিত

- সংসদ সমার্থ শব্দকোষ **55·00**

সাহিত্য সংসদ
৩২এ আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড, কলকাতা-৯

সুন্দরবন-জীবন ও জীবিকা

তারকমোহন দাস

সুন্দরবনের ধারেপাশে যে সব মানুষ বাস করে তাদের তিনটি প্রধান জীবিকা, প্রথমটি হ'ল বন থেকে কাঠ, গোলপাতা, মধু ও মোম সংগ্রহ করা। দ্বিতীয়টি হল নদী থেকে মাছ ধরা, তৃতীয়টি হল চাষবাষ করা। এখানে মিষ্ট জলের খুবই অভাব। অনেক জায়গায় দূর-দূরান্ত থেকে পানীয় জল আনতে হয় নৌকা করে, অনেক সময় তা পানের অযোগ্য। দূষিত জল পান করে এখানে রোগ ও মৃত্যুহার খুবই বেশি। এখানে এলে নিদারুণ প্রকৃতির সঙ্গে যুদ্ধ করে মানুষ কিভাবে বেঁচে আছে তার ছবি চোখে পড়ে। একদিকে অসহনীয় দারিদ্র, অন্যদিকে আইন শৃঙ্খলার কোন বালাই নেই। এখানকার মানুষ আজ বাঘের থেকে ডাকাতকে বেশি ভয় করে। অভাবের তাড়নায় অনেকে ডাকাত হয়ে যায়। বাংলাদেশ থেকেও হানাদারেরা আসে প্রাকৃতিক সম্পদের লোভে।

যারা মৌচাক ভেঙ্গে মধু ও মোম সংগ্রহ করে তাদের মৌলি বলে। মার্চ-এপ্রিল মাসে ছোট ছোট দলে বিভক্ত হয়ে এরা বনের গভীরে প্রবেশ করে। তার আগে এরা বনবিবির পূজা সেরে নেয়, কেননা এরা নিশ্চিত জানে যে তাদের মধ্য থেকে বেশ কিছু মানুষ আর ফিরে আসবে বা, বাঘের আক্রমণে নিহত হবে। সুন্দরবনের মৌমাছিরা গাছের ডালের ওপর অতি বিরাট আকারের মৌচাক তৈরি করে, এক একটি চাক থেকে প্রায় দশ কেজি মধু পাওয়া যায়, এই মৌমাছিগুলির আকার একটু বড়, এদের নাম রক্-বি বা এপিস্ ডরসাটা (Apis dorsata)।

ভারতে যত অভয়ারণ্য আছে তার মধ্যে সুন্দরবনের ব্যাঘ্র-প্রকল্পের অরণ্যেই বাঘের সংখ্যা সবচেয়ে বেশি, প্রায় দুশো-টির কাছাকাছি। সুন্দরবনের ব্যাঘ্র-প্রকল্পের অন্তর্গত সংরক্ষিত অরণ্যের আয়তন 2585 বর্গ কিলোমিটার, এর মূল কেন্দ্রীয় অংশের পরিমাণ 1330 বর্গ কিলোমিটার।

বিশেষজ্ঞদের মতে পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে সুন্দর বন্য-প্রাণী হল এই বাঘ। শক্তি ও সৌন্দর্যের এমন দুর্লভ সমন্বয় অন্য কোন প্রাণীর দেহে দেখা যায় না। অন্য অরণ্যের তুলনায় সুন্দরবনের বাঘকে শিকার সংগ্রহের জন্য অনেক বেশি পরিশ্রম করতে হয়, এখানকার বাঘগুলি তেমন হৃষ্টপুষ্ট নয়, কিন্তু খুবই বলিষ্ঠ এবং পেশীবহুল দেহ। সুন্দরবনের বাঘ সাঁতারে খুব পটু, শুধু ডাঙ্গায় নয় জল থেকেও তারা খাদ্য সংগ্রহ করে, মাছ ও কাঁকড়া তাদের অন্যতম খাদ্য। জোয়ারের সময় বনভূমির বেশ কিছু অংশ জলপ্লাবিত হয়। অন্যান্য অরণ্যে প্রতিটি বাঘের যেমন একটি নির্দিষ্ট এলাকা থাকে, নিজ মলমূত্রের সাহায্যে তা চিহ্নিত করে রাখে, এখানে তা রাখা সম্ভব নয়, সুন্দরবনের বাঘ সাঁতার কেটে প্রায়ই একে অন্যের এলাকায় প্রবেশ করে।

সুন্দরবনের বাঘ মানুষ খায়, প্রতি বছর কুড়ি থেকে চল্লিশটি মানুষ বাঘের আক্রমণে নিহত হয়। এই বাঘের আক্রমণ নিয়ন্ত্রণ করবার জন্য নানা উপায় অবলম্বন করা হচ্ছে, তার মধ্যে ইলেকট্রিফায়েড ডামি অন্যতম। বনের মধ্যে মাটির মানুষের মূর্তি তৈরি করে, গায়ে মানুষের ব্যবহৃত জামা কাপড় চড়িয়ে সর্বাঙ্গে ইলেক্ট্রিকের তার জড়িয়ে রাখা হয়, কারেন্ট আসে ব্যাটারী থেকে। মানুষ ভেবে বাঘ মূর্তিটিকে আক্রমণ করলেই দারুণ ইলেকট্রিক শক্ খাবে, এই তিক্ত

প্রতি বছর কুড়ি থেকে চল্লিশটি মানুষ বাঘের আক্রমণে মারা পড়ে

অভিজ্ঞতা থেকে বাঘ শিক্ষা লাভ করবে—"মানুষ অতি বিপজ্জনক প্রাণী, মানুষের মাংস সুস্বাদু তো নয়ই, তা খাবারই উপযুক্ত নয়।"

বাঘের আক্রমণে যে সব মূর্তি বিধ্বস্ত হয়েছিল তা থেকে আমরাও কিছু শিক্ষা লাভ করেছি, আমরা দেখেছি বাঘ সব সময় চুপি চুপি এসে পেছন থেকে ঝাঁপিয়ে পড়ে সামনা-সামনি আক্রমণ খুব কমই করে। তাই বাঘকে বিভ্রান্ত করবার জন্য আজকাল কাঠুরিয়া, জেলে ও মৌলিরা মাথার পেছনে মানুষের মুখোস এঁটে বনের গভীরে প্রবেশ করছে, মানুষের কোনটা সামনে আর কোনটা পেছন তা বুঝতে না পেরে বাঘ আক্রমণ থেকে বিরত থাকছে। বনরক্ষীরা কাঁধের ওপর শক্তবর্ম ও মোটা লাঠি ফেলে ঘুরছে। এসব পদ্ধতিতে আজকাল ভাল ফল পাওয়া যাচ্ছে।

সুন্দরবনের আজ অনেকগুলি সমস্যা। সুন্দরবনের চারপাশে অতিদ্রুত হারে আজ জনসংখ্যা বাড়ছে, যার চাপে বনভূমির সঙ্কোচন ঘটছে, অতিরিক্ত আহরণের ফলে বনজ সম্পদ ধ্বংস হচ্ছে। এই ধ্বংস বন্ধ করা দরকার। সৌর-শক্তির সাহায্যে আলো জ্বালান, সৌর চুল্লীর সাহায্যে রান্না-বান্না ইত্যাদির প্রচলনও এই বনজ সম্পদ রক্ষার অন্যতম সম্ভাব্য উপায়, যা ভবিষ্যতে আশা করা যায় খুবই কার্যকর হবে। কলকাতা থেকে খাল ও নদীর মাধ্যমে বিপুল পরিমাণ দূষিত পদার্থ এখানকার জমিতে যোগ হচ্ছে' মাটির মধ্যে বসবাসকারী জীবাণুদের তাতে ক্ষতি হতে পারে, তার ফলে এই পরিবেশের উৎপাদন ক্ষমতাই প্রচণ্ড ভাবে ব্যাহত হবে, এটা অবিলম্বে বন্ধ হওয়া দরকার। তাছাড়া এখানে অফিস ও শৃঙ্খলা রক্ষার বিষয়টিও খুব জরুরী হয়ে উঠেছে।

সুন্দরবন পশ্চিমবঙ্গের তথা ভারতের এক অসাধারণ মূল্যবান সম্পদ, একে সর্বপ্রকারে রক্ষা করা আমাদের সকল-কারই দায়িত্ব। সুন্দরবন সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা করবার আজ তাই বিশেষ প্রয়োজন দেখা দিয়েছে। আমাদের দেশের সকলেরই এই বিষয়ে অবহিত হওয়া প্রয়োজন।

[28 পৃষ্ঠার পর]

এই গঙ্গাবক্ষে নিক্ষেপিত হয়ে গঙ্গানদীকে দূষিত করছে। অনুরূপে বিহারের দামোদর নদের জলে ফার্টিলাইজার কর্পোরেশন থেকেই প্রতিদিন অ্যালকালি, ক্লোমেট, অ্যামোনিয়া সায়নাইড, ফেনল ও ন্যাপথালিনের পরিত্যক্ত অংশ এলে মিশছে এবং দামোদর নদের জলকে বিষাক্ত করছে।

দিল্লীর যমুনা নদীর জলে ডি ডি.টি. কারখানার পরি-ত্যক্ত বিষ প্রতিদিন এসে মিশছে। যমুনার জল এমনভাবে বিষাক্ত হচ্ছে যে একে বিশুদ্ধ করণের রাসায়নিক দিয়ে কম পক্ষে প্রায় 8000 বার বৈজ্ঞানিক শোধন করা হলে তবে সে জলে স্বাভাবিক কাজ চলবে।

এই দূষণের প্রভাবে জলে অক্সিজেনের মাত্রা কমে যায় ও জলজীবনে সংশয় দেখা দেয়।

প্রবাহিত জলে অবাঞ্ছিত আবর্জনার মধ্যে অনেক জৈব পদার্থ থাকে। এইসব জৈব পদার্থ জলের মধ্যে বর্তমান ব্যাকটেরিয়া দ্বারা বিয়োজিত হয়। তার ফলে জলে অক্সিজেন এর ঘাটতি হয়। এই ভারসাম্যহীনতার ফলে বেশির ভাগ অমেরুদণ্ডী ও শামুক জাতীয় প্রাণী মারা যায়।

এছাড়া জাহাজ থেকে চুঁইয়ে পড়া তেল বা তৈল শোধনাগারের অবাঞ্ছিত উপজাত দ্রব্যে নদী ও সমুদ্রের জল দূষিত হচ্ছে। আর এই তেলের হাইড্রোকার্বন মাছের ফুলকার পাতলা গিল আচ্ছাদনকে আক্রমণ করায় এই আচ্ছাদন থেকে মিউকাস ক্ষরণ হতে থাকে। মাছের জীবন বিপন্ন হয়। এইভাবে দেখা যায় অনেক প্রজাতির মাছ আজ বিলুপ্তির পথে।

তোমরা আরও আশ্চর্য হবে সমীক্ষায় দেখা গেছে কলকাতার নালা নর্দমার ভিতর দিয়ে দৈনিক যে পরিমান ময়লার ধোয়ানি প্রবাহিত হয়, উপযুক্ত ব্যবস্থা নিলে তার থেকে প্রায় 200 টন নাইট্রোজেন, 50 টন ফসফরাস, 100 টন পটাশ সার পাওয়া সম্ভব। অর্থমূল্য এর বাৎসরিক 20 কোটি 50 লক্ষ টাকা। আর বছরের পর বছর আমরা ঐ বিপুল পরিমান অর্থ গঙ্গায় বিসর্জ্জন দিচ্ছি, নষ্ট করছি লক্ষ লক্ষ টন মূল্যবান সার। আর কি করছি? নদীর গভীরতাকে কমাতে সাহায্য করছি। যার ফলে নদীর নাব্যতা হারিয়ে ভয়াবহ বন্যা হয়।

পরিবেশ বিজ্ঞানীদের মতে বছরে 6000 টন মাটি নদী বা সমুদ্রগর্ভে চলে যাচ্ছে। ফলে গত দশ বছরে বন্যা প্লাবিত এলাকার সামগ্রিকতা প্রায় দ্বিগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে।

দূষণ বৃষ্টিকেও রেহাই দেয়নি। আমাদের ধারণা ছিল বৃষ্টির জল পরিশ্রুত বর্ত্তমানে বৃষ্টির জলে কার্বলিক অ্যাসিড, সালফিউরিক অ্যাসিড, নাইট্রিক অ্যাসিড ইত্যাদি ধরা পড়েছে। এটা কি ভাবে সম্ভব? বিভিন্ন কলকারখানা, পেট্রোল, ডিজেল চালিত যানবাহন থেকে নির্গত হয় কার্বন-ডাই-অক্সাইড, কার্বন মনো অক্সাইড, সালফার ডাই অক্সাইড, নাইট্রাস অক্সাইড ইত্যাদি এবং সেগুলি হাওয়ায় মেশে। বৃষ্টি হওয়ার সময় বাতাসের অক্সাইডগুলি বৃষ্টির জলের সঙ্গে বিক্রিয়া করে এবং আসিডে পরিণত হয়। যদিও এই অ্যাসিডের মাত্রা সামান্য তবুও আমাদের সতর্ক হতে হবে। সুস্থ পরিবেশের জন্য সচেতনতা বোধ জাগিয়ে তুলতে হবে।

পরিবেশ ও মানুষ

পার্থসারথি চক্রবর্তী

ছেলেবেলায় দেখতাম পাড়ার খুদির মা রাস্তা দিয়ে গোবর জল ছিটোতে ছিটোতে বাড়ি ঢুকছেন। পাশের বাড়ির ন্যাড়া কোথায় ঘাপটি মেরে লুকিয়ে ছিল। খুদির মা বাড়ি ঢুকবার মুখে সে জোরে ছুটে যাবার ছল করে ওঁকে ছুঁয়ে দিত। ন্যাড়ার বাপান্ত করতে করতে খুদির মা আবার নদীতে ডুব দিয়ে মাথায় গঙ্গাজল ছিটিয়ে তবে বাড়ি ঢুকতেন। নিজের বাড়ি ও তার ধারে-কাছের পরিবেশ সম্পর্কে এই ধরনের সচেতন লোক ছিলেন ঠিকই—তবে বেশির ভাগই হলো শুচিবায় গ্রস্ত। আজ প্রায় চল্লিশ বছর পরে এমন শুচিবায় গ্রস্ত লোকের সংখ্যা অনেক কমেছে, তবে নিজের পরিবেশ সম্পর্কে সজাগ, ওয়াকিবহাল ও পরিবেশকে ভালোবাসেন এমন মানুষের সংখ্যা বেড়েছে কি?

এখনও পর্যন্ত মহাকাশে পৃথিবী ছাড়া অন্য কোথাও প্রাণের অস্তিত্ব আবিষ্কৃত হয়নি। পৃথিবীতে প্রাণসৃষ্টির অনুকূল পরিবেশ থাকার জন্যেই অবশ্য এখানে বহুবিচিত্র প্রাণীর আবির্ভাব ঘটেছে। এই অনুকূল পরিবেশে প্রকৃতি আমাদের প্রতিদিন কতো যত্ন করে লালন-পালন করছে—প্রতিদানে প্রকৃতিকে আমরা কি দিই? যে অনুকূল যোগ্য পরিবেশে আমরা বেড়ে উঠে মাটির বুকে নিজেদের ধন্য মনে করছি, সেই পরিবেশকে বিষিয়ে তুলে আমাদের অস্তিত্বকেই কি বিপন্ন করে তুলছি না? বায়ু, জল আর খাদ্যবস্তু—এই তিনটি জিনিস হলো জীবন ধারণের পক্ষে একান্তভাবে অপরিহার্য। এদের কোনও একটি দূষিত হলে আমাদের জীবন, শুধু আমাদের জীবনই বা বলি কেন—সমগ্র প্রাণী জগতের অস্তিত্বই বিপন্ন হতে পারে। এরা সকলে মিলে একসঙ্গে এগিয়ে এলে তো কথাই নেই।

উদ্ভিদের যথেচ্ছ বংশ উচ্ছেদ করে পরিবেশের কার্বন-ডাই-অক্সাইড গ্যাস ও অক্সিজেনের সমতা নষ্ট করে চলেছি—সেদিকে আমাদের বিন্দুমাত্র ভ্রূক্ষেপও নেই। কলকারখানার ধোঁয়া, নদী ও পুকুরের জল দূষণ, শহর কেন্দ্রিক জীবন-যাত্রায় যানবাহন ও মাইকের পিলে চমকানো শব্দ, নোংরা আবর্জনা থেকে দুর্গন্ধ, যেখানে সেখানে ধূমপান আমাদের প্রাত্যহিক জীবনকে বিষময় করে তুলেছে। তাই প্রকৃতি ও পরিবেশ সম্বন্ধে জনসাধারণের মনে একটা চেতনা জাগানোর সময় এখন এসেছে—একথা বলাই বাহুল্য। পরিবেশকে ভালো ভাবে বাঁচিয়ে রাখতে হলে আমাদের সমাজে পারস্পরিক সম্প্রীতি ও সৌহার্দ্যের সম্পর্ক গড়ে তুলতে হবে। সকলকে একথা জানানো দরকার যে—'মশাই, আপনি নিজে বাঁচুন ও অপরকে বাঁচতে দিন।'

পৃথিবীতে প্রাণের অস্তিত্ব না থাকলে এ জায়গাটা কেমন বিবর্ণ দেখাতো যে তা ভাবাও মুশকিল।

এই রূপ-রস-বর্ণ-গন্ধে ভরা বিচিত্র ধরণীর নয়নাভিরাম রূপের বেশির ভাগ অংশই সৃষ্টি করেছে জীবরাই, নানারকম উদ্ভিদ ও জীবজন্তু। এরা সব সময়েই প্রাণহীন প্রস্তর, মাটি ও বায়বীয় পদার্থ ইত্যাদি বস্তুকে নানাপ্রকার জৈব পদার্থে পরিণত করে চলেছে। পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলের প্রাকৃতিক চেহারা পাল্টে দিয়ে, জীবিত প্রাণীদের এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় সরিয়ে, প্রকৃতির নিয়মমাফিক ইকোলজির সঙ্গে মানুষের খেয়াল, শৃঙ্খলাবোধ ও শিল্পের অপূর্ব সংমিশ্রণ—এই ধরণীকে আরও সুষমামণ্ডিত করে তুলছে। যদিও একথা অস্বীকার করে লাভ নেই যে প্রকৃতির স্বাভাবিক নিয়মে পরিবর্তন আনতে গিয়ে মানুষ অনেক সময় নিজের সর্বনাশও ডেকে এনেছে। ব্যাপক কৃষিকর্ম, শিল্পোৎপাদন, পারমাণবিক বোমার পরীক্ষা-নিরীক্ষা, বৃহৎ শিল্পে মারাত্মক গ্যাস ইত্যাদি সংরক্ষণের অনুপযুক্ত ব্যবস্থা প্রকৃতিতে যে অনেক সময় বিপর্যয়ের সূচনা করেছে তার ভূরি ভূরি দৃষ্টান্ত দেওয়া যায়। ভুপাল গ্যাস ট্রাজেডির কথা আজ শুধু আমাদের দেশই নয়—পৃথিবীর সবাই জানে। অতীতের অভিজ্ঞতা স্মরণ করিয়ে দেয় যে আজ আমাদের প্রাকৃতিক নিয়মকানুন সম্বন্ধে আরও বেশি জ্ঞান প্রয়োজন। এছাড়া প্রাকৃতিক পরিবেশ সংরক্ষণের ব্যাপারে আমাদের আরও শ্রদ্ধাশীল হতে হবে।

প্রাকৃতিক পরিবেশের উপর যেমন যথেচ্ছ হস্তক্ষেপ করা সমীচীন নয়—সেই সঙ্গে আরও একটা গুরুত্বপূর্ণ কথাও মনে রাখা আমাদের আশু কর্তব্য। সেটা হলো প্রকৃতিই যে প্রকৃতির সব কিছু ভালো বোঝে ইকলজির এই তত্ত্বেরও কিছু ব্যতিক্রম রয়েছে।

প্রাকৃতিক পরিবেশের নিয়ম হলো একটা ভারসাম্য অবস্থা বজায় রাখা—অবশ্য যদি কেউ এই পরিবেশে অনধিকার চর্চা না করে। প্রকৃতি থেকে যে সব আবর্জনা গড়ে ওঠে সেগুলিকে প্রকৃতি স্বাভাবিকভাবে নতুন করে জীবনচক্রের প্রয়োজনে কাজে লাগায়। যেমন গাছ থেকে

ফল মাটিতে পড়ে, কাঠবেড়ালি ঐ ফল খায়। হিংস্র জীবজন্তু কাঠবেড়ালি খায়। বিভিন্ন জীবাণু ঝরা পাতা, মৃত উদ্ভিদের দেহ, বিষ্ঠা—এইসব জিনিসকে সার অথবা জীবন ধারণের পক্ষে প্রয়োজনীয় অন্য উপাদানে রূপান্তরিত করে। এই সমস্ত বস্তুকে দেহের উপাদান হিসাবে কাজে লাগায় নতুন উদ্ভিদ। কাজেই এই উপায়ে প্রাকৃতিক নিয়মের ভারসাম্য বজায় থাকে। প্রাকৃতিক পরিবেশকে তাই বলা চলে একান্তভাবে আত্মনির্ভরশীল। প্রাকৃতিক পরিবেশে আত্মনির্ভরশীল ও নিজের সমস্যার সমাধান নিজে করে নিতে পারলেও দেখা গেছে প্রকৃতিকেও অনেক সময় জোড়াতালি দিয়ে সমস্যার সমাধান করতে হয়। জীবজন্তুর সংখ্যা নিয়ন্ত্রণের ব্যাপারে প্রকৃতি যে একেবারে ত্রুটিমুক্ত নয়—একথা তো আমরা সকলেই জানি।

এছাড়া আরও একটা গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার আছে। তা হলো, প্রকৃতি লক্ষ লক্ষ বছর ধরে মাটির নীচে জমে থাকা কোটি কোটি টন উদ্ভিদদের ধ্বংসাবশেষ (যেমন, কয়লা, তেল ইত্যাদি) স্বাভাবিক নিয়মে জীবনের আবর্তনচক্রে পুণঃ-প্রবেশ ঘটাতে সম্পূর্ণ অক্ষম। মানুষ মগজ খাটিয়ে মাটির অভ্যন্তরের ধন সম্পত্তি উদ্ধার করে, পুড়িয়ে যখন আবার তাকে উদ্ভিদের পুষ্টি সাধনের কাজে লাগায় তখন পরিবেশের স্বাভাবিক নিয়মের রাজত্বে মানুষ অনুঘটকের কাজ করে থাকে। যদিও কোনও স্থানে তেল, কয়লা ইত্যাদি পুড়িয়ে ফেলার পর তার উপাদানগুলো মাটি বাতাস ও জলের মধ্যে দিয়ে আবার এত তাড়াতাড়ি পরিবর্তন চক্রে প্রবেশ করে যে সেই অঞ্চলের পরিবেশের ভারসাম্যতাও বিলক্ষণ ভারাক্রান্ত হয়ে পড়ে।

আজ যখন মানুষ প্রাকৃতিক পরিবেশকে বিষময় করে তুলছে তখন পিছনের দিকে তাকিয়ে দেখতে ইচ্ছে করে আমাদের পূর্বসূরী মানুষের কাজকর্মের ধারা। প্রাকৃতিক পরিবেশে মানুষ হস্তক্ষেপ করার আগে এর বেশির ভাগই ছিল বিশৃঙ্খল ঘনজঙ্গলে পরিপূর্ণ আদিম বনভূমি। একথা ঠিকই যে—ঘন অরণ্যে সবুজের সমারোহ আছে, এর বিশাল ধ্যানগম্ভীর একটা মহিমাও হয়তো আছে। কিন্তু এই পবিত্র প্রকৃতি আরও মহিমামণ্ডিত হয়ে ওঠেন যখন তাতে মানুষের পেলব হাতের স্পর্শ লাগে। মানুষের নিজের হাতে তৈরি তৃণ-ভূমি, হ্রদ ও উদ্যানের দিকে একবার দৃষ্টিপাত করলেই ব্যাপারটা পরিষ্কার হবে। এখানে বেসুরো প্রকৃতির বুকে মানুষ যেন সুরের পরশ বুলিয়ে দিয়েছে।

এ পরশ যেন কঠিন প্রকৃতিকে কখনও করেছে কোমল, প্রদাহে লেপন করেছে শান্তি, অথবা তার গাম্ভীর্যে এনে দিয়েছে স্বতঃস্ফূর্ত আবেগোচ্ছ্বাস। যদিও একথা অনস্বীকার্য যে তুষারধবল গিরিশৃঙ্গের নিস্তব্ধতা, পাহাড়ের বুক থেকে নেমে আসা সুন্দরী ঝর্ণার কলরব, মহাসমুদ্রের শত সহস্র ঢেউ-এর কল্লোলনিনাদ অথবা বনভূমির কাকলী মানুষের মনে এক গভীর শ্রদ্ধা ও বিস্ময়ের সৃষ্টি করে।

আজ কিছু মানুষ প্রাকৃতিক পরিবেশকে ভালবাসতে ও বুঝতে শিখেছে—এ ব্যাপারটি সম্ভবত প্রকৃতিও জানে। মানুষ বুদ্ধি খাটিয়ে প্রাকৃতিক সম্পদ নিজেদের কল্যাণকর্মে নিয়োজিত করছে। মানুষ ও পরিবেশের 'উপযুক্ত' সহাবস্থানের ফলে দেখতে হবে যেন তারা পরস্পরকে মানিয়ে নিতে পেরেছে—আর দুজনাই সামান্য হেরফের ঘটিয়ে নিজেদের উপকার করতে পারছে। শিল্পজগতে দেখা যায় মানুষ মগজ খাটিয়ে ল্যাবরেটরীতে যে রাবার উৎপাদন ঘটিয়েছে তা প্রাকৃতিক রাবারের চাইতে বহুগুণে উৎকৃষ্ট। প্রকৃতির সৃষ্টি মানুষ তাই মগজ খাটিয়ে তার প্রিয় প্রাকৃতিক পরিবেশকে দূষণ মুক্ত করে আরও সুন্দরতর করে তুলবে এ বিশ্বাস আমাদের আছে। যেটা আশু প্রয়োজন তা হল জনসাধারণের মধ্যে প্রাকৃতিক পরিবেশ সংরক্ষণের গুরুত্বের বিষয়টা জোর কদমে প্রচার করা। কারণ শুধুমাত্র আমাদের মতো উন্নয়নশীল দেশেই নয়, অনেক উন্নত দেশেও সাধারণ মানুষ পরিবেশ সম্পর্কে সম্পূর্ণ সচেতন হয়ে ওঠেন নি। প্রাকৃতিক সম্পদ সংরক্ষণ যখন সমৃদ্ধির অন্যতম হাতিয়ার এবং জীবনের সূক্ষ্মতম অনুভূতির সঙ্গে এর সম্পর্কও নিবিড় তখন উন্নয়নশীল বিশ্বে প্রকৃতি সংরক্ষণে আমাদের অগ্রণী ভূমিকা নিয়ে এগিয়ে আসতে হবে। এ শুভ বুদ্ধি একদিন জাগ্রত হবেই—এ বিষয়ে আমাদের মনে বিন্দুমাত্র সন্দেহের অবকাশ নেই।

জয়ন্ত দত্ত সঙ্কলিত

নিজে নিজে কর

প্রথম খণ্ড ॥ তৃতীয় মুদ্রণ প্রকাশিত হয়েছে ॥ দাম দশ টাকা

দ্বিতীয় খণ্ড ॥ দ্বিতীয় মুদ্রণ প্রকাশিত হয়েছে ॥ দাম দশ টাকা

প্রতিখণ্ডে প্রায় অর্ধশত মডেলের সার্কিট ডায়াগ্রাম সহ নির্মাণ প্রণালীর ব্যাখ্যা

শৈব্যা প্রকাশন বিভাগ ॥ ৮৬/১ মহাত্মা গান্ধী রোড, কল-৫

খুদে বৈজ্ঞানিক
ওরেম্মা! মেছো সাপ!
!
ছোটলোককোথাকার! তুই আমাকে ভয় দেখালি কেন?
হিঃ হিঃ হিঃ! হাঃ হাঃ হাঃ!
না বুঝেই ভয় পেয়ে গেলি! কী মেয়েরে তুই?
বারে! হঠাৎ কারো মুখের সামনে কিছু নড়লে সে ভয় না পেয়ে গান গেয়ে উঠবে নাকি?
এ ভাবে আচমকা কাউকে ভয় দেখাতে নেই খুদে! পুঁটি, তুইও শুনে রাখ। ভয় হচ্ছে মনের ব্যাপার। দুর্ব্বল মনই আবেগপ্রবণ। এরা সহজেই উত্তেজিত হয়ে পরে।
–ফলে দেহের বিভিন্ন গ্রন্থিগুলোতেও প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়—এগুলো থেকে তখন হরমোন নির্গত হতে থাকে। ফলে, জৈব রাসায়নিক ক্রিয়াগুলো ব্যাহত হয়ে মানুষকে নানা কুকর্মে প্রভাবিত করে।
তার মানে ভয় টয় সব দেহস্থিত জৈবিক ক্রিয়া-কলাপ। এটা যদি মনে রাখিস, দেখবি ভয় উত্তেজনা, আবেগ কখনও তোর মনে ঠাঁই পাবে না।

বুঝলি কিছু ? আয় ঐ ছেলেটাকে একটু টেস্ট করে দেখি, তাহলেই ব্যাপারটা তোর কাছে পরিষ্কার হয়ে যাবে।
এইবার, দ্যাখ !
ইয়াম্মা !
ভু-ভু-ভূত ! আমাকে খেয়ে ফেললে !
এ আবার ছায়া দেখেই ভয় পায় ! হাঃ-হাঃ-হাঃ !
এ ভাবে একটা বাচ্চা ছেলেকে ভয় দেখিয়ে কিছু বোঝা যায় না !
অলরাইট ! ঐ দ্যাখ উঁহু, একমনে বসে কি যেন পাঁটাতে ব্যস্ত। আয় ওকে একটু টেস্ট করে দেখি।
মাংসের প্যাটিস্-গুলোর সত্যই জবাব নেই ! কেউ আমার আগেই—
ইয়াগ্ ! মনে হচ্ছে, গন্ধের চোটে কোনো একটা ভয়ঙ্কর কুকুর আমার পেছনে এসে দাঁড়িয়েছে !

খ্যিঃ-খ্যিঃ-খ্যিঃ !
দেখলি ভয় এমনই জিনিস যে,মানুষ তার বিচার-বুদ্ধি পর্যন্ত হারিয়ে ফেলে !

ইয়াঃ, প্যা-টি-স !
বেচারা, কি আর করবি ! নে,খেয়ে নে। নইলে বাকে খাবে !
তুইথা !

বুবুর ? বাঃ, চমৎকার করেছিস ! তবে আমি অত ভীতু নই যে,ভয় পাবো।

ওরেব্বাস !
এতো ছায়া নয়, কায়া !

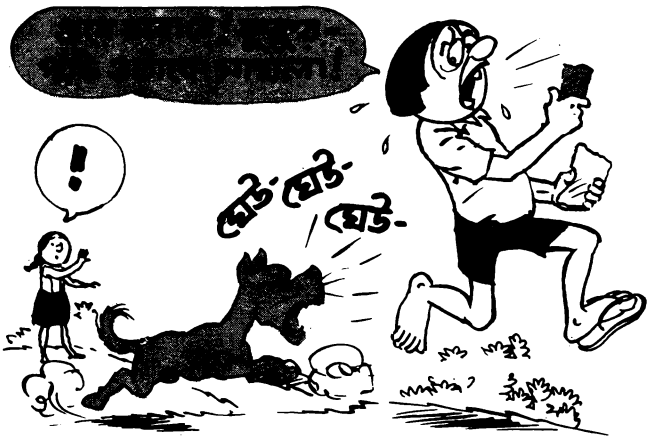
!
ঘেউ ঘেউ-
ঘেউ-

ওফস !
আর একটু হলেই জান খারাপ করে দিয়েছিল !
ঘেউ-ঘেউ-
র-র-র-

ওরেব্বাস !
হতচ্ছাড়াটা দেখছি আমার জান না নিয়ে যাবে না !
তুই মিছেমিছি ভয় পাচ্ছিস খুদে ! ওর উদ্দেশ্য তোর হাতের দ্রব্য - জান নয় !

ওফস্! ঠিক বলেছিস। খাবারটার জন্যই ব্যাটা অমন তাড়া করেছিল!
সেটা এতক্ষণ বাদে বুঝতে পারলি?
এতে বেশ বোঝা গেল, দুর্বল মন সহজেই ভয় পায় এবং উত্তেজিত হয়ে বুদ্ধি শুদ্ধি হারিয়ে ফেলে এবং—
তার মানে বলতে চাইছিস, আমি ভীতু? আমার মন দুর্বল? আমি-
আরে না না, তুই নয়। তোর দেহে যে গ্ল্যান্ড নার্ভ ইত্যাদি আছে সেগুলোই তো এর মূলে। এজন্যই বলছি তোকে আর একটু সংযমী হতে হবে তাহলেই—
হুম্, আমার সঙ্গে একটু সম্বন্ধে কথা বলবি!
মরেছে!
কি হলো? হঠাৎ কেমন আবেগ-প্রবণ হয়ে পরেছিস মনে হচ্ছে! এতো ভাল লক্ষণ নয়।
না না, আমাকে এখুনি বাড়ি যেতে হবে!
ওঃ হো! আমি এখন সত্যিই অসহায়। এখানে আর এক মুহূর্ত থাকা সম্ভব নয়!
হিঃ হিঃ হিঃ। আসল কথা হল ও ভয় পেয়েছে! আর তার উৎস হল জেঠু। এখানে আর কাউকে খাপ খুলতে হবে না।

জলদূষণ এবং আমরা

এণাক্ষী বিশ্বাস

পরিবেশ নিয়ে চিন্তা ভাবনার সময় এসেছে। কারণ সভ্যতার অগ্রগতি পরিবেশকে করে তুলেছে ভারসাম্য-হীন। মানুষ যে সভ্যতার সৃষ্টিকর্তা, সেই সভ্যতার শিকার আজ মানুষ নিজেই। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যার অগ্রগতির ফলে নানা প্রতিকূল পরিবেশের সৃষ্টি। তাই জীবজগতের অস্তিত্ব আজ বিপর্যয়ের মুখে।

পরিবেশের দূষণ বা ভারসাম্যহীনতার পরিণাম দেখে বিশ্ববাসী আজ ভীত। তাই সারা পৃথিবীতে সবাই পরিবেশ দূষণ মোকাবিলায় ব্যস্ত।

রাষ্ট্রসঙ্ঘ পৃথিবীর বিজ্ঞানীদের হুশিয়ারী দিয়েছে পরিবেশ বিশুদ্ধ রাখার কাজে মানুষকে সচেতন করে তুলতে। 5 জুন, 1972 সুইডেনের স্টকহোম সম্মেলনে বিশ্ববাসী অঙ্গীকার বদ্ধ হয়েছিলেন। পরিবেশদূষণ রোধ করার জন্য বিশ্ববাসীকে সচেতন করে তুলতে, তাই 5 জুন পরিবেশ দিবস রূপে পালন করা হয়।

পরিবেশ কিভাবে ধূষিত হচ্ছে সেটি আগে জানা দরকার। পরিবেশ বলতে জল, স্থল, বায়ু ও বনজ সকলকেই বোঝায়। এখানে কেবল জল কিভাবে দূষিত হচ্ছে এবং ধীরে ধীরে কি ধরনের ভয়াবহ পরিস্থিতির উদ্ভব হচ্ছে সে সম্বন্ধে কিছু কথা বলব।

গ্রাম বাংলা দিয়ে শুরু করি। ক্রম বর্ধমান জনসংখ্যা বৃদ্ধি হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে কৃষি বিপ্লব এসেছে। কৃষিতে জোরালো রাসায়নিক সার প্রয়োগে কৃষির ফলন বেড়েছে ঠিকই. কিন্তু তার সঙ্গে দূষণও বেড়েছে। কী ভাবে? জমিতে ফলন বৃদ্ধির জন্য ব্যবহৃত সারের সবটাই যে কৃষিদ্রব্য উৎপাদনে কাজে লাগে তা নয়। বেশ কিছু সার জলের সঙ্গে মিশে চুঁইয়ে মাটির নিচের জলভাণ্ডারে জমা হয়। এর ফলে শুধু যে মূল্যবান সারের অপচয়ই ঘটে থাকে তা নয়, মাটির উপরকার এবং ভূগর্ভস্থ জলের মানও হ্রাস পায়। অর্থাৎ পরিবেশের জলমণ্ডল দূষিত হয়ে পড়ে। অ্যামো-নিয়াম সালফেট বা ইউরিয়া প্রয়োগ করলে যতখানি নাইট্রোজেন যৌগ মাটির মধ্যে দিয়ে চুঁইয়ে যায়, নাইট্রেট যৌগ ব্যবহারে তার চেয়ে অনেক বেশি নাইট্রোজেন যৌগ বেরিয়ে যেতে পারে।

পানীয় জলে অজৈব নাইট্রোজেন যৌগের পরিমান বেড়ে গেলে সেই জলের মাধ্যমে শিশুদের নাইট্রাইট বিষক্রিয়ায় মিথোমোগ্লোবিনিয়া এবং বয়স্কদের অন্ত্রে নাইট্রোসামিন জমার ফলস্বরূপ ক্যানসারের সম্ভাবনা বেড়ে যায়। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা পানীয় জলের নাইট্রেট N এর সীমামান স্থির করে দিয়েছেন তা নিরাপদ মাত্রা 113 মিলিগ্রাম N লিটার-এর নীচে এবং বিপজ্জনক মাত্রা 22·3 মিলিগ্রামের ওপরে।

আবার রাসায়নিক সারের মাধ্যমে সীসা, ক্যাডমিয়াম, আর্সেনিক ইত্যাদি কিছু কিছু ভারী ধাতুও মাটিতে জমা হয়। জলের সঙ্গে চুঁইয়ে মাটিগর্ভে জল ভাণ্ডারে জমা হয় এবং দূষণের সম্ভাবনা বেড়ে যায়। কিছুদিন আগে তোমরা খবরের কাগজে দেখে থাকবে টিউবওয়েলের জলের মধ্যে আর্সেনিকের সন্ধান পাওয়া যায়। যাঁরাই এই টিউবওয়েলের জল পান করেছিলেন সকলেই অসুস্থ হয়ে পড়েন। শরীরের বিভিন্ন স্থানে কাল কাল দাগ পড়তে থাকে।

অপরদিকে লোনা জমি উন্নয়নের জন্য ব্যবহৃত জিপসাম বা ফসফোজিপসাম থেকে জলে ফ্লোরিন দূষণ ঘটতে দেখা গেছে। উদ্ভিদ ও প্রাণী উভয়ের পক্ষেই অতিরিক্ত ফ্লোরিণ বিষাক্ত মৌল হিসাবে কাজ করে।

গ্রামবাংলায় জলের প্রধান উৎস পুকুর, দীঘি ইত্যাদি। সেখানেও নিজেদের অজ্ঞতার ফল দেখা যায়। যে পুকুরে গরু মহিষ স্নান করে, বাসন মাজে, কাপড় কাচা হয়, সেই পুকুরের জল পানীয় জল রূপে ব্যবহার করা হয়। ফলে ঐ পুকুরের জল বাহিত জীবাণু আমাদের শরীরে প্রবেশ করে এবং নানা রোগের সৃষ্টি করে। সুতরাং গ্রামাঞ্চলে পানীয় জলের পুকুর সংরক্ষিত করা একান্ত প্রয়োজন। অথবা পানীয় জলের জন্য গভীর নলকূপ খননের ব্যবস্থা দরকার। গ্রামবাসীদের এ সম্বন্ধে সচেতনতা বোধ জাগিয়ে তোলা একান্ত প্রয়োজন।

অপরদিকে নদীর পাড়, বাঁধ ইত্যাদি ভেঙে গেলে কতক গুলি মারাত্মক প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়। পরিষ্কার ঠাণ্ডা জল গরম কর্দমাক্ত জলে পরিণত হয়। কাদামাটি, আবর্জনা যা ভাসতে থাকে এবং তা জলে আলো প্রবেশে বাধা সৃষ্টি করে। ভারী পদার্থ নিচে গিয়ে পড়ে এবং নদীগর্ভকে চাপা দেয়। ফলে নদীগর্ভের পোকা বা তাদের শূককীট, শামুক ও অন্যান্য প্রাণীর জীবনহানি হয়। মাছের অপার-কুলামের ক্যাভিটি ও ফুলকো কাদামাটিতে পূর্ণ হয়। শ্বাস কার্য ব্যাহত হওয়ায় মাছ মারা যায়। এইভাবে শামুক

গ্রামাঞ্চলে পানীয় জলের পুকুর সংরক্ষিত হওয়া দরকার

শ্রেণীর ম্যাণ্টল এবং ফুলকো কাদামাটিতে পূর্ণ হয় এবং তাতে ঐসব প্রাণীরা আহত হয়। ট্রাউট ও স্যামন মাছ সাধারণতঃ নদীর পাথুরে জায়গায় ডিম পাড়ে। কাদামাটি, বালি জলে ভাসতে ভাসতে এই সমস্ত পাথরের গায়ে আটকে যায়। ফলে তাদের ডিমগুলি অক্সিজেনের অভাবে মারা যায়।

শিল্পের সম্প্রসারণ ও পরিকল্পনাহীন ভাবে শহরের আয়তন বৃদ্ধি হওয়ার ফলে পৃথিবীর মেট্রোপলিটন শহর ও শহরতলীতে দ্রুত দূষিত পরিবেশ গড়ে উঠেছে।

শিল্প কারখানার উপজাত দ্রব্য যেগুলি বিষাক্ত রাসায়নিক পদার্থ সেইগুলি নদী অথবা সমুদ্রের জলে নিষ্কাশিত করা হয়। জলজ প্রাণীর ক্ষেত্রে সেগুলি মারাত্মক। তাই দেখা যায় জলজ বহুপ্রাণী ও উদ্ভিদ প্রজাতির বিলুপ্তি ঘটেছে ও ঘটছে।

আবর্জনার মধ্যে অনেক সময় ভারী ধাতু থাকে। সাধারণতঃ যে সব ধাতুর পরমানু সংখ্যা 23 এর বেশি তাদের ভারী ধাতু বলা হয়। এইসব ধাতু বৃষ্টির জলের সঙ্গে নদী ও সমুদ্রের জলে এসে মেশে। নদী ও সামুদ্রিক প্রাণীরা এই জল গ্রহণ করে। ফলে এইসব ধাতু তাদের শরীরে জমা হয়। দেহের মধ্যে ভারী ধাতুর পরিমান নির্ধারিত মাত্রার চেয়ে বেশীহলে কেবল যে বৃদ্ধিও বিপাকের ক্ষতি হর তা নয় অনেক ক্ষেত্রে জীবের মৃত্যুও হতে পারে। এইসব ধাতুর মধ্যে ভ্যানাডিয়ম, ম্যাঙ্গানিজ, পারদ, ক্রোমিয়াম নিকেল, আরসেনিক, তামা, সীসা প্রধান।

প্রতি দশ লক্ষ ভাগ কয়লা ও খনিজ তেলের মধ্যে এটি 1^{6} থেকে 170 ভাগ থাকে এবং প্রচুর পরিমানে তেল-কয়লা জ্বালিয়ে পরিবেশে ছড়ানো হয়। এই ভ্যানডিয়ম পেণ্টাকসাইড শ্বাসনালীতে জ্বালা সৃষ্টি করে এবং শরীরে কোলিনোষ্টারেজ এনজাইম উৎপাদন বাহত করে, যেটি ভিটামিন বি উৎপাদনে সহায়ক।

সাধারণতঃ ইলেকট্রোপ্লেটিং কারখানা, ক্রোমলেদার কারখানা, ক্রোম ইস্পাত কারখানা থেকে এটি পরিবেশে ছড়ায়। ক্রোমিয়াম আমাদের নাকে ক্ষত সৃটি করে ও চর্মরোগ ঘটায়।

ম্যাঙ্গানিজ খনি ও কারখানা থেকে ম্যাঙ্গানিজ ছড়ায়। ম্যাঙ্গানিজের কথা বেশি করে বলতে হয় কারণ ম্যাঙ্গানিজ উৎপাদনে ভারত প্রথম সারিতে।

ম্যাঙ্গানিজ নিউমোনিয়া ও স্নায়বিক রোগ ঘটায়। সন্দেহ করা হচ্ছে নিকেল, আরসেনিক ও ক্রোমিয়াম ক্যানসার রোগের অন্যতম কারণ।

গঙ্গা নদীর তীরে অবস্থিত প্রায় 269টি কারখানায় অপ্রয়োজনীয় বিষাক্ত রাসায়নিক পদার্থ, মারাত্মক ধাতু ইত্যাদি

[শেষাংশ 20 পৃষ্ঠায়]

কীটনাশকের দৌরাত্ম্য—গ্রামে ও শহরে

সুধাংশু পাত্র

অনেকের ধারণা, আজকে শহরগুলোতে মানুষের প্রচণ্ড চাপ ব্যাঙের ছাতার মত গজিয়ে ওঠা অসংখ্য কলকারখানা, নানা ধরণের রাসায়নিক পদার্থ উৎপাদন, পিঁপড়ের সারির মত গাড়ী, পরিত্যক্ত আবর্জনা, প্রচণ্ড শব্দ ও কোলাহল, বিষাক্ত গ্যাস—ধূলো ও ধোঁয়া ইত্যাদির প্রভাবে সেখানকার জল, বায়ু ও মাটির দূষণের মাত্রা বিপদসীমা ছাড়িয়ে গেলেও গ্রামগুলো এখনও দূষণ মুক্ত। গ্রামে মুক্ত হাওয়া আছে, গাছ-পালার সমারোহ আছে, ফাঁকা-ফাঁকা মাঠ আছে, বুঝিবা অখণ্ড নীরবতাও বিরাজ করছে।

কিন্তু এ ধারণা ভুল। সবুজ বিপ্লবকে কেন্দ্র করে যেভাবে টন টন কীটনাশক ছড়ানো হচ্ছে এবং রাসায়নিক সার প্রয়োগ করা হচ্ছে, তাতে গ্রামের মাটি, জল, হাওয়া কোনটিই শুদ্ধ নেই। বরং কোন কোন ক্ষেত্রে শহর অপেক্ষাও ভয়াবহ আকার ধারণ করেছে। এতে গাঁয়ের জনস্বাস্থ্য বিপর্যস্ত এবং শহরগুলোতেও পড়ছে তার ক্ষতিকর প্রভাব। কেননা গ্রামের উৎপন্ন সব্জী, মাছ, মাংস ও নানা ধরণের খাদ্যশস্য শহর-বাসীদের গ্রহণ করতে হয় এবং এই খাদ্যের মাধ্যমে কী গ্রাম, কী শহর উভয় জায়গার মানুষের জীবন বিপন্ন বললেও মনে হয় অত্যুক্তি করা হবে না।

শুনলে অনেকেই আশ্চর্য হবেন, সবুজ শাক-সব্জীকে সব-সময় একরকম কীটনাশকে ভিজিয়ে রাখেন কৃষকরা। নির্দিষ্ট সময় অতিক্রান্ত হওয়ার আগেই ঝিঙে, ঢেঁড়শ, পটোল বেগুন প্রভৃতিকে চালান দিতে হয় বাজারে। কেননা মাত্র দু-চারদিন অপেক্ষা করলেই এগুলো বিক্রির অনুপোযোগী হয়ে পড়ে এবং এসব সব্জীর বাগানে পোকা-মাকড়ের উপদ্রব অত্যন্ত বেশি। কোন কোন সব্জীর ক্ষেত বিশেষ করে বেগুনের ক্ষেত প্রস্তুত করার সময় কৃষকরা মাটিতে এমন সব বিষ প্রয়োগ করেন যে, পুরো গাছটিই তেতো হয়ে যায়। ধানেও প্রয়োগ করা হয় এমন বিষাক্ত দ্রব্যসামগ্রী। বর্তমানে আবার উন্নত ফলনশীল বীজকে ব্যবহার করা হচ্ছে এবং বিনা সার ও ওষুধে আদৌ ফলনও দেয় না। তবে এও প্রমাণিত যে, কীটনাশক প্রয়োগের পর নির্ধারিত সময় অতিক্রান্ত হয়ে গেলেও বিষের অবশেষ ফসল ও সব্জীতে বিদ্যমান থাকে এবং সেগুলো মানবদেহের পক্ষে অত্যন্ত ক্ষতিকরও বটে।

সবচেয়ে দুঃখের কথা, যে সমস্ত কীটনাশকের ভয়াবহ ক্ষতির কথা চিন্তা করে পাশ্চাত্য বহু বছর আগে ওদের সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ করে দিয়েছে, আমরা তাদের প্রয়োগ শুধু অব্যাহত রাখিনি বরং বাড়িয়েই চলেছি। তাদের মধ্যে প্রধান হচ্ছে গ্যামাক্সিন ও ডি.ডি.টি। এদের প্রভাবে জল, হাওয়া ও মাটির কেবল দূষণ হয় না—মানবদেহে নানা রোগেরও সৃষ্টি করে। তাদের মধ্যে ক্যানসার অন্যতম। আজকে ক্যানসার যে এত ব্যাপক আকার ধারণ করেছে তার মূলে অন্যান্য অনেক কারণ থাকলেও কীটনাশকের দৌরাত্ম্য অন্যতম প্রধান কারণ। আর গ্যামাক্সিন, ডি.ডি.টি এবং ক্লোরিণঘটিত ও পারদঘটিত কীটনাশকই বিশেষজ্ঞদের মতে সবচেয়ে বেশি ভয়াবহ।

গ্যামাক্সিন ও ডি ডি টি কোথায় ব্যবহার হচ্ছে না! সব্জীর ও ফসলের ক্ষেতে তো বটেই, ধান, গম, ছোলা, মটর প্রভৃতির গুদামেও ছড়ানো হচ্ছে পোকার আক্রমণ রোধ করতে। পোলট্রিতে দেওয়া হচ্ছে মুরগীর গায়ের উকুনকে এবং সেখানকার জীবাণুদের বিনাশ করতে। ফলে আমাদের সমূহ খাদ্যই বিষাক্ত। অঙ্কুরিত ছোলাকে আর এখন ভিটামিন সমৃদ্ধ খাবার বলতে দ্বিধা হচ্ছে, ডিমের সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম ছিদ্র পথে ঢুকে রয়েছে কীটনাশকের অবশেষ; পালং ও নটে শাকে মিশে আছে বিষ, উচ্ছে, বেগুন, ঢেঁড়শ, পটোল তাও বিষে জর্জরিত। আমাদের যে এত প্রিয় ফল আম তাকেও সুরক্ষার জন্য মুকুল আসার কালে কীট নাশক স্প্রে করা হয়। অপরদিকে সবরকম ফলকে পাকানো হয় কারবাইড, তুঁতে নয়ত ইথিলিন গ্যাসের দ্বারা।

আর মাছ? নদী ও পুকুরের মাছতো নিরাপদ নয়, অপরদিকে গ্রামে-গঞ্জে দৈবক্রমে পুকুরের পাশের সব্জি ক্ষেত থেকে কীটনাশক ধুয়ে এসে পুকুরে পড়লে মাছ যখন মৃতপ্রায় অবস্থায় ভাসতে থাকে তখন মালিককে দেখেছি সাত তাড়াতাড়ি সেগুলোকে ধরে আড়তে চালান করে দিতে। আড়তে বরফ চাপা দিয়ে পাঠিয়ে দেওয়া হয় দূরবর্তী শহরে।

তাই আজ একটি প্রশ্ন, আমরা কী খাবো? বিশ্ব স্বাস্থ্য-সংস্থা জোর গলায় প্রচার চালাচ্ছেন, একবিংশ শতাব্দীতে মানুষের গড় পরমায়ুকে একশ বছরে নিয়ে যাবেন, শিশু মৃত্যুকে রুদ্ধ করে দেবেন, রোগব্যাধিকে নির্মূল করবেন। কিন্তু কীটনাশকের বিষে জর্জরিত আমরা তৃতীয় বিশ্বের মানুষ কী পারবো একবিংশ শতাব্দীর উন্নত বিজ্ঞানকে স্বাগত জানাতে?

কীটনাশকের বিষময় ফল অন্য জায়গায়ও প্রতিফলিত হচ্ছে। এরই মধ্যে বহু ক্ষতিকর কীটপতঙ্গ সহনশীলতা

অর্জন করে নেওয়ায় সাধারণ বিষে তাদের কিছু হচ্ছে না। নিত্য নতুন আরও সব উগ্র বিষকে প্রয়োগ করতে হচ্ছে। প্রমাণ হিসেবে মশার কথাই ধরা যেতে পারে। যেসব জায়গায় বিকল্প চাষ হয় সেসব জায়গায় প্রচণ্ড গরমের দিনে সূর্যাস্তের পরে ঘরে কিংবা ফাঁকা জায়গায় কোথাও একটুখানি বসা যায় না। ঐ সব মশার কামড়ে যে ধরণের ম্যালেরিয়া বা অন্যান্য অসুখ হচ্ছে তাকে সারাতে চিকিৎসকরা হিমসিম খেয়ে যাচ্ছেন। ভুক্তভোগী মাত্রই জানেন, এখন গ্রামের বাতাসে সব সময় কীটনাশকের দুর্গন্ধ। ক্ষেতের পাশ দিয়ে চলতে গেলেই দুর্গন্ধে শ্বাসরুদ্ধ হওয়ার মত অবস্থা হয় এবং মুখগহ্বর ও জিভে প্রদাহ সৃষ্টি হয়।

তাই এখন শুধু শহর নয়, গ্রামের হাওয়াও দূষিত এবং বলা যায় যে, দূষণের পরিমাণ গ্রামেই অধিক। আর এজন্য দায়ী তথাকথিত সবুজ বিপ্লব।

অনেকের আজ ধারণা, সবুজবিপ্লব পাশ্চাত্যের সাম্রাজ্যবাদী দেশের কূট-কৌশল। তাঁরা যখনই বুঝতে পেরেছিলেন—পৃথিবীতে যেভাবে জনজাগরণ শুরু হয়েছে, তাতে কোন দেশকে আর শাসনের মাধ্যমে শোষণ করা যাবে না। শোষণের বিকল্প সন্ধান করতে গিয়ে চোখে পড়েছিল তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোর চরম খাদ্যাভাব। তখনই তাঁরা বিজ্ঞানকে হাতিয়ার করে কোটি কোটি ডলার অর্থব্যয় করে আবিষ্কার করেছিলেন উন্নত ফলনশীল বীজ, উন্নত কৃষি যন্ত্রপাতি, নানা ধরণের কীটনাশক এবং উন্নত সেচ ব্যবস্থা। "সবুজ বিপ্লব" এই নামটাও তাঁদের দেওয়া এবং হাতিয়ারগুলো আবিষ্কারের পরে মনোভাবটি চালান করে দিয়েছিলেন বিশেষ করে প্রাচ্যের দেশগুলোতে।

খাদ্য-সমস্যায় জর্জরিত সমূহ দেশই কোন চিন্তা-ভাবনা না করে এবং দেশীয় কোন গবেষকের দ্বারা পরীক্ষা না করে লুফে নিয়েছিলেন উক্ত প্রস্তাবকে। সাম্রাজ্যবাদীদের আকাঙ্ক্ষাও পূর্ণ হয়েছিল। যে পরিমাণ অর্থ ব্যয় করেছিলেন, তার বিশগুণ অর্থ জমা পড়লো যন্ত্রপাতি, বীজ, কীটনাশক, সার ইত্যাদি বিক্রি করে।

এর ক্ষতিকর ক্রিয়ার কথা সেদিন তাঁরা কিন্তু উপলব্ধি করেছিলেন। এবং পাশ্চাত্যের কোন কোন জনদরদী বিজ্ঞানী সাবধানও করে দিয়েছিলেন। বলেছিলেন, সবুজ বিপ্লবের দ্বারা পরিবেশ শুধু দূষিত হবে না, অদূর ভবিষ্যতে জন্মগ্রহণ করবে পঙ্গু ও বিকলাঙ্গ এক সমাজ। মেধারও ঘাটতি ঘটবে।

তাঁদের সে ভবিষ্যদ্বাণীকে পাগলের প্রলাপ ভেবে উড়িয়ে দিয়েছিলেন অথবা সমস্যার আশু সমাধান করতে সবুজ বিপ্লবকে ডেকে এনেছিলেন সে দিনের-রাষ্ট্র নায়করা। তার বিষময় ফল ফলতে শুরু করেছে এতদিনে। ক্যানসার ধীরে ধীরে ব্যাপক আকার ধারণ করেছে, ঘরে ঘরে আস্ত্রিক জণ্ডিস, অম্ল ও আলসার। সত্য সত্যই আজ মেধারও ঘাটতি যথেষ্ট। বিকলাঙ্গ মস্তিষ্কের জন্য সমাজে উচ্ছৃঙ্খলতার পরিমাণও ক্রমশঃ বৃদ্ধি পেয়ে চলেছে। এইভাবে চলতে থাকলে আগামী একবিংশ শতাব্দীতে তৃতীয় বিশ্বের সমূহ দেশে এক রুগ্ন ও পঙ্গু সমাজের যে সৃষ্টি হবে সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।

সবুজ বিপ্লব ও কীটনাশকের পেছনে যে সাম্রাজ্যবাদী মনোভাব ছিল তা এতদিনে পরিষ্কার হয়ে উঠেছে। বিশেষ করে ভূপালের গ্যাস দুর্ঘটনা যেন চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছে। ওরা নিজেদের দেশকে বিশুদ্ধ রাখতে এবং কীটনাশক ও সারের চাহিদা মেটাতে তৃতীয় বিশ্বের বুকের উপর কারখানা খুলেছে স্বদেশের কোম্পানীগুলির মাধ্যমে। নিজের দেশের মেসিন কারবন মনঅক্সাইড নামের বিষাক্ত গ্যাস বমন করার পূর্বেই চালান করে দিয়েছে প্রাচ্যে। অনেকের বিশ্বাস, এককালে পাশ্চাত্য থেকে অনুদান হিসেবে যে ডি.ডি.টি পাওয়া গিয়েছিল—তার পেছনেও ছিল প্রাচ্যকে পঙ্গু করে দেওয়ার মনোভাব। প্রচুর ডি.ডি.টি তৈরি হওয়ার পর যখন ধরা পড়লো ওর ক্ষতিকর ক্রিয়া, তখনই সেগুলোকে নষ্ট করে ফেলার প্রয়োজন হয়ে পড়ে। কিন্তু কোথায় ফেলবে? যেখানেই ফেলা হোক না কেন, তার দ্বারা জল, হাওয়া, মাটি, জনস্বাস্থ্য সবই বিপন্ন হবে। অতএব?

অতএব পঙ্গু হবে তো হোক তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলো। রুদ্ধ হয়ে যাক ওদের প্রতিভা বিকাশ, আর পঙ্গুদের উপর চিরকাল চালানো যাক শাসন ও শোষণ। তাই দানের নামে ঘরে ঘরে বিষকে ছড়িয়ে গেছে।

মানসিক দিক থেকে আমরা যে যথেষ্ট পঙ্গু হয়ে পড়েছি তার প্রমাণ, সেই ডি.ডি.টির ব্যবহার এখনও পরিত্যাগ করিনি আমরা। সরকার থেকেও নিষিদ্ধ করণের চাপও আসছে না। পরন্তু কৃষকদের বলতে শুনেছি, সেদিনের সেই খাঁটি বিদেশী জিনিস কী আছে যে কাজ হবে? নাকি বিদেশী মেসিন? কিন্তু কিছুতেই তাঁদের বোঝাতে পারা যায় না যে, সেগুলো ছিল অতীব মায়াত্মক

এই অবস্থায় আমার তো মনে হয়, শহর ও গ্রাম উভয়ের স্বার্থে শহরের বিজ্ঞান সংস্থাগুলোকে ছুটে আসতে হবে গ্রামের কৃষকদের কাছে। সবুজ বিপ্লবকে বরবাদ দেওয়া চলবে না। তবে অপেক্ষাকৃত নির্দোষ কীটনাশক প্রস্তুতির জন্য সরকারকেই গবেষক নিয়োগ করতে হবে এবং অভিজ্ঞ কৃষকদের সাহায্য গ্রহণ করতে হবে। শুধু কৃত্রিম বনসৃজন করলে এর হাত থেকে রক্ষা পাওয়া যাবে না।

পোঃ কালিন্দী, মেদিনীপুর

রেণুর রেখা

সঙ্কর্ষণ রায়

[তিন]

ল্যাবোরেটারিতে এসে সুবীর বললে, 'কোদাভাতিঘণ্টি বীর বরাহ লক্ষীনরসিংবৃর্তি যে নির্দোষ তা' আমাদের প্রমাণ করতে হবে। স্লাইডগুলো পরীক্ষা কর করবী।,

ভুরু কুঁচকে সুবীরের মুখের দিকে তাকিয়ে করবী বললে, 'স্লাইড্‌গুলোর মধ্যে খুনীর হদিশ আছে নাকি?'

'থাকতেও পারে। কথায় বলে, যেখানে দেখিবে ছাই উড়াইয়া দেখ তাই, পাইলে পাইতে পার অমূল্য রতন।'

'তোমার এই স্লাইডগুলোতে আছে রক্তমাখা ধুলো। পুরুষোত্তমের ডেড্‌ বডি থেকে তাইতো তুলেছ তুমি। মাইক্রোস্কোপে এই ধুলোই দেখতে পাব বহুগুণ আকারে।

'দেখোই না, ধুলো ছাড়া আরও কিছু দেখতে পার...'

অণুবীক্ষণ যন্ত্রের (মাইক্রোস্কোপ) স্টেজে একটি স্লাইড্‌ রেখে আই-পিসের (eye-piece) মধ্য দিয়ে দেখতে থাকে করবী। দেখতে দেখতে সে বললে, 'বাতাসে যে ধুলো ভেসে বেড়ায় তাই দেখতে পাচ্ছি। কিন্তু তা ছাড়া...

'তা ছাড়া কি?' ব্যগ্র স্বরে প্রশ্ন করে সুবীর?

'তা ছাড়া আরও কিছু আছে। ফুলের রেণু বা স্পোর (spore)। এই দেখ...

মাইক্রোস্কোপের আই-পীসে চোখ রেখে করবীর দৃষ্টি অনুসরণ ক'রে দেখবার চেষ্টা করে সুবীর। দেখতে পাচ্ছে ...বালির কণার মত দেখতে, কিন্তু বালির কণা নয়...

'কোন্ ফুলের রেণু বলতে পার?' সুবীর প্রশ্ন করে।

'না।' করবী জবাব দিল, 'আমার মাইক্রোস্কোপের মধ্যে খুব বেশি ম্যাগনিফিকেশন (magnification) হয় না, অতএব এটা কোন গাছের স্পোর তা এই মাইক্রোস্কোপের সাহায্যে বোঝা যাবে না। চাই জোরালো মাইক্রোস্কোপ।'

ডক্টর হার্টজ্‌ হীরের লেন্স দিয়ে মাইক্রোস্কোপ বানাচ্ছেন, হয়তো সেটাই হবে পৃথিবীর সবচেয়ে জোরালো মাইক্রোস্কোপ। কিন্তু সেটা তৈরি হ'তে সময় লাগবে অনেক, ইতিমধ্যে খোঁজ নিয়ে দেখি কোথায় কোন ল্যাবোরেটারিতে হাই-পাওয়ার মাইক্রোস্কোপ আছে...

'কি লাভ এই স্পোরগুলোকে চিনে?' করবী প্রশ্ন করে।

'লাভ এই যে স্পোরগুলোকে চেনা গেলে কোন্ গাছের ফুল থেকে এসেছে তা বোঝা যাবে।'

'তা না হয় গেল। কিন্তু তা থেকে হত্যাকারীর হদিশ মিলবে কী?'

গম্ভীর মুখে মাথা নাড়তে নাড়তে সুবীর বললে, 'মিলতেও পারে।'

করবী ঠাট্টার সুরে বললে, 'বাতাসে ভেসে আসা ফুলের রেণু দেখে খুনীর হদিশ মিলেছে' এমন কথা কী কেউ শুনেছে?'

না—পৃথিবীর কোন গোয়েন্দা, এমন কি শার্লক্ হোমস্‌ও শোনেন নি। কিন্তু তাই বলে তাকে অসম্ভব ব'লে উড়িয়ে দিতে পার না। কারণ মাইক্রোস্কোপের মধ্যে এই যে ফুলের রেণু দেখা যাচ্ছে, তা হয়তো খুনীর হাতে ছিল। খুনী হয়তো খুন করার আগে ফুল তুলেছে কিংবা ফুল নিয়ে নাড়াচাড়া করেছে।'

মৃদু হেসে করবী বললে, 'খুন করার আগে ফুল তোলে বা ফুল নাড়াচাড়া করে, এমন খুনীর কথা কিন্তু শুনিনি আমি।'

'আমিও শুনিনি।' সুবীরের মুখের ভাব খুব গম্ভীর: 'পৃথিবীতে কেউই হয়তো শোনে নি। কিন্তু মৃতদেহের গলায় ও কাঁধে ঘাম ও রক্তের সঙ্গে তা মিশে আছে, কাজেই তাকে উপেক্ষা করতে পারি না আমরা।

খোঁজখবর নিয়ে জানা গেল যে তাদের মাইক্রোস্কোপের চেয়ে জোরালো মাইক্রোস্কোপ আছে ব্যাঙ্গালোরের বৈজ্ঞানিক গবেষণা কেন্দ্রে। সঙ্গে সঙ্গে তারা দুজনে ব্যাঙ্গালোর যাত্রা করল। চিঠিপত্র লিখে আগের থেকেই সব ব্যবস্থা করা ছিল, কাজেই গবেষণাকেন্দ্রে গিয়ে কাজ শুরু করতে কোন অসুবিধে হল না তাদের।

গবেষণাকেন্দ্রের উদ্ভিদ্ বিজ্ঞান বিভাগে ছিল মাইক্রো-স্কোপটি। গবেষণাকেন্দ্রের একজন উদ্ভিদ্ বিজ্ঞানীর তত্ত্বাবধানে এই মাইক্রোস্কোপ নিয়ে তারা কাজ শুরু করে। মাইক্রোস্কোপের স্টেজের ওপরে স্লাইড বসিয়ে তার ওপর "হাই পাওয়ার লেন্স্ (high power lens)" লাগিয়ে তারা আই-পিসে (Eye piece) চোখ রাখে। স্পোরগুলো লেন্সের মধ্য দিয়ে বড়ো হ'য়ে উঠে ছর্‌রা বুলেটের আকার ধারণ করেছে। কিন্তু যতই বড় হ'য়ে উঠুক, তাদের সূক্ষ্ম নক্শাগুলি পুরোপুরি ফুটে ওঠে নি। করবী বললে, 'নক্শাগুলো ঠিকমত ফুটে না উঠলে স্পোরগুলোকে চেনা যাবে না। তবে এইটুকু বোঝা যাচ্ছে যে এগুলো সবই স্পোর, ধুলোর কণা একটিও নেই।'

আই-পিসে চোই রেখে সুবীর দেখল, করবী ঠিকই বলেছে—সবই স্পোর, ধুলিকণা একটিও নয়। স্পোর, চেনার মত উদ্ভিদ্ বিজ্ঞানের জ্ঞান তার নেই, অতএব করবীর কথাই সে মেনে নেয়।

তাদের কাজে সাহায্য করছিলেন যে উদ্ভিদ্ বিজ্ঞানী তিনি বললেন, এর চেয়ে জোরালো মাইক্রোস্কোপ এদেশে কোথাও পাবেন না। জার্মানি বা জাপানে অবশ্য পেতে পারেন...'

মাদ্রাজে ফিরে এসে সুবীর বললে, 'আমার ধারণা কন্যা-কুমারীতে ডক্টর হার্টজের ল্যাবোরেটারিতেই পেয়ে যাব...'

ডক্টর হার্টজের সঙ্গে টেলিফোনে যোগাযোগ করল সুবীর। সব কথা শুনে তিনি বললেন, 'হীরে কেটে লেন্স' তৈরি করছি। নিজের হাতেই করছি, কারণ এ কাজ আর কারুর দ্বারা হবার নয়। লেন্স তৈরি হ'লে মাইক্রোস্কোপ বসাব, তারপর তৈরি হয়ে যাবে পৃথিবীর সবচেয়ে জোরালো, মাইক্রোস্কোপ। তৈরি হ'লেই জানাবো তোমাদের...

স্লাইডগুলোকে বাক্সে ভরতে গিয়ে সুবীর দেখল, প্রত্যেকটি স্লাইডের গায়ে রক্তের দাগ আছে। পুনুষোত্তম প্যাটেলের মৃতদেহ থেকে স্লাইড্-এর ক্যানাডা বালসম-এর আঠায় ধুলোর নমুনা তুলতে গিয়ে উঠে এসেছে এই রক্তের দাগ। শুকিয়ে কালো হয়ে গিয়েছে, প্রত্যেকটি স্লাইডের কাচের ওপরে ছোট বড় নানা আকারের কালো ছোপ সৃষ্টি করেছে। সুবীরের হঠাৎ এই রক্ত পরীক্ষা করার ঝোঁক চাপল।

ক্যানাডা বাল্‌সম-এর সীমার বাইরে স্লাইডের কাচে যে রক্তের ছোপগুলি রয়েছে, তাদের অ্যালকহল দিয়ে ধুয়ে সে কাচের বিকার-এর (beaker) মধ্যে ঢালল। তারপর শুরু করল রক্ত-মেশানো অ্যালকহল-এর রাসায়নিক পরীক্ষা।

রক্ত। কার রক্ত? শিউরে উঠল করবী

করবী তার পাশে এসে দাঁড়িয়ে বললে, 'ব্যাপার কী, কী টেস্ট করছ ?'

'রক্ত।' গম্ভীর মুখে জবাব দিল সুবীর।

'রক্ত'। কার রক্ত ? শিউরে উঠল করবী।

ভয় নেই, আর কারুর নয়, পুরুষোত্তম প্যাটেলের। স্লাইডগুলোতে শুকিয়ে ছিল, অ্যালকহল দিয়ে ধুয়ে নিয়ে পরীক্ষা করছি।'

'রক্ত পরীক্ষা করে লাভ ?'

সুবীর বললে, 'লিট্‌মাস পেপারগুলো এগিয়ে দাও, দেখিয়ে দিচ্ছি কি লাভ।'

'দেখেছ !' খানিকক্ষণ বাদে সুবীর রুদ্ধশ্বাসে বললে, 'নীল লিটমাস পেপার লাল হ'য়ে উঠেছে। তার মানে পুরুষোত্তম প্যাটেলের রক্ত এ্যাসিডিক (acidic)—অর্থাৎ তাঁর রক্তে এ্যাসিড এসে মিশেছে।'

'কি ক'রে ?, করবী প্রশ্ন করল, 'খুনী কি তাঁর রক্তে এ্যাসিড মিশিয়ে দিয়েছিল ?

'তাই তো মনে হয়। বোধ হয় ঐ ক্ষুরটাতে এ্যাসিড-জাতীয় পদার্থ মাখানো ছিল। দাঁড়াও ভেঙ্কটরাজনকে ফোন করে ক্ষুরটাকে আনিয়ে নিচ্ছি ...

ক্ষুরটা নিয়ে ভেঙ্কটরাজন নিজেই এসে হাজির হলেন ল্যাবারেটারিতে।

'ক্ষুরটাকে মুছে পরিষ্কার করে রাখেন নি তো ?' সুবীর প্রশ্ন করে।

'না।' ভেঙ্কটরাজন জবাব দিলেন, 'আমি তো খুনীর বন্ধু নই যে এ কাজ করব। এই দেখুন না, ক্ষুরের ফলায় লাল রক্ত কালো হয়ে আছে।'

ক্ষুরটা নিয়ে সুবীর ক্ষুরের ফলার ওপরে এ্যালকহল ঢালল। সেই এ্যালকহল বিকারে নিয়ে লিটমাস পেপার দিয়ে সে পরীক্ষা করে। নীল লিটমাস লাল হ'য়ে ওঠে।

'এ্যাসিড এই ক্ষুরের ফলাতেও আছে !" সুবীর বললে, 'খুনী ক্ষুরের ফলায় এ্যাসিড-জাতীয় পদার্থ মাখিয়ে নিয়েছিল। তবে খুবই হাল্কা জাতের এ্যাসিড, যেমন ফলের রস...

ভেঙ্কটরাজন বললেন, 'অস্ত্রে ফলের রস মাখিয়ে নেয়, এমন খুনীর দেখা আগে কখনো পাই নি !'

সুবীর বললে, 'ফলের রস শুধু নয়, ফুলের রেণুও আছে। মাইক্রোস্কোপে স্লাইড্‌গুলো পরীক্ষা করে ফুলের রেণু দেখতে পেয়েছে করবী।

অর্থাৎ খুনী পুরুষোত্তমকে খুন করার আগে ফুলগাছ থেকে ফুল তোলে, খুরের ফলায় ফলের রস মাখায়। অদ্ভুত খুনী ! দাঁড়ান রক্ত মাখানো এ্যালকহলের নমুনাগুলি আরও একটু পরীক্ষা করি।

রক্ত মেশালে অ্যাল্‌কহলে ফেলিংস সলিউশন (Fehling's solution) ঢেলে বার্ণারে গরম করে সুবীর। কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যে তার মধ্যে নিবিড় নীল রং ফুটে ওঠে।

দেখেছেন তো ভেঙ্কটরাজন, চিনি। তরল পদার্থের নীল রঙের দিকে এক দৃষ্টে তাকিয়ে থেকে সুবীর বললে, 'রক্তে চিনি বা গ্লুকোজ আছে ব'লেই এই নীল রং ফুটে উঠেছে। তার মানে হয় পুরুষোত্তম প্যাটেলের ডায়েবিটিস ছিল, নয়তো ফলের রস থেকে চিনি এসেছে।

ভেঙ্কটরাজন বললেন, 'অদ্ভুত খুনী, খুবই অদ্ভুত !'

আপনার নৃসিংহ অবতার কি এমন অদ্ভুত হতে পারে ! ভাল কথা ভেঙ্কটরাজন, ডক্টর হার্ট্‌জ্‌ হীরেটা নিয়ে নিরাপদে তাঁর গন্তব্যে, অর্থাৎ তাঁর কন্যাকুমারীর ল্যাবোরেটারিতে পৌঁছে গিয়েছেন। টেলিফোন ক'রে জানলাম যে ঐ হীরে দিয়ে তিনি লেন্‌স্‌ তৈরি করেছেন। অতএব আপনি যে ধরে নিয়েছিলেন যে নরসিংহমূর্তি হীরেটি আত্মসাৎ করার জন্য খুন করেছিলেন, তা ভুল।'

হতবুদ্ধির মত ফ্যাল ফ্যাল ক'রে সুবীরের মুখের দিকে তাকিয়ে থেকে ভেঙ্কটরাজন বললেন, তা হলে কিসের জন্য খুন করল নৃসিংহ অবতার !'

সুবীর বললে, খুন আপনার নৃসিংহ অবতার নয়, আর কেউ করেছে....

'কে সে ?'

'আজব একটি মানুষ। পুরুষোত্তমের ঘরে ঢুকে তার দাড়ি কামাবার ক্ষুরে ফলের রস ও ফুলের রেণু মাখায় তারপর তা দিয়ে খুন করে নৃশংসভাবে... [ক্রমশঃ]

বেশ তো! আমাদের ১১,০০০ ইঞ্জিনের মধ্যে বেছে নাও কোনটি তোমার পছন্দ; —এদের মধ্যে ৮,০০০ টিরও বেশি হল স্টীম ইঞ্জিন, ২,০০০-এর কিছু বেশি ডিজেল আর প্রায় ১,০০০ হল বৈদ্যুতিক ইঞ্জিন। এছাড়াও রয়েছে কয়েকশ 'এমু' কোচ। এখন সারা দেশ জুড়ে ৭৫,০০০ কিমি রেলপথে ৭,০০০-এরও বেশি স্টেশন আছে। তুমি যখন বড় হবে তখন দেখবে স্টেশনের সংখ্যা আরও কত বেড়ে গেছে; বেড়ে গেছে রেলপথের দৈর্ঘ। তাছাড়া, তখন আরও দ্রুতগামী ডিজেল আর বৈদ্যুতিক ইঞ্জিনের সংখ্যাও অনেক বেড়ে যাবে। জানো কি এইসব ইঞ্জিন এখন এ দেশেই তৈরি হচ্ছে এবং কিছু কিছু রপ্তানীও করছি আমরা।

কিন্তু শুধু রেলগাড়ী চালাবে কেন, সারা রেলওয়েকে চালানোর দায়িত্বও একদিন তোমাদের হাতে এসে পড়বে। দেশকে আরো দ্রুত প্রগতির পথে এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে—এ তো তোমাদেরই কাজ! তাড়াতাড়ি বড় হয়ে ওঠ—দেখবে কত মজার কাজ তোমার জন্যে অপেক্ষা করে আছে।

পূর্ব রেলওয়ে

বেলু আর কালু দুই বন্ধু। বন্ধুত্ব নিবিড় কিন্তু প্রতিযোগিতা আছে তাদের মধ্যে চরম। দুজনেই সব সময়ে চেষ্টা করে কে কাকে টেক্কা দিয়ে ওপরে উঠবে বা নাম কিনবে। এই দুঃসাহসিক অভিযানে বেরোনোর শখ তাদের বহুদিনের। সংবাপত্র বা বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় প্রায়ই দেখা যায় বিভিন্ন দুঃসাহসিক অভিযানের কথা। কতলোক গিরিশৃঙ্গ জয় করছে, সাইকেলে বিশ্ব পরিভ্রমণে বেরুচ্ছে আবার কেউ বা নৌকা নিয়ে সমুদ্রে পাড়ি দিচ্ছে। এই সমস্ত দুঃসাহসিক অভিযানে আনন্দ আর গৌরব দুইই আছে। তাইতো বেলু আর কালু অনেকদিন ধরে চেষ্টা করছে এই ধরণের একটা অভিযানে বেরুনোর। অবশেষে সেই সুদিনটা এসেই গেল তাদের সামনে। এসে গেল বললে ভুল হবে—বলা ভাল সুযোগ তৈরী করা হলো—একটা দুঃসাহসিক সমুদ্র অভিযানের। এ ধরনের অভিযানের জন্য বড় কারও সাহায্য অবশ্যই প্রয়োজন। অনেক সাধ্য সাধনার পর ক্ষুদে দুই বিজ্ঞানী টুনু কাকুকে রাজী করাতে পেরেছে। টুনুকাকু হলেন কালুর বাবার ছোট বেলার বন্ধু। তিনি থাকেন কানাডাতে, কিছুদিনের জন্য এসেছেন কলকাতায়। তিনিই এ বিষয়ে তাদের সবদিক দিয়ে সাহায্য করবেন বলে কথা দিয়েছেন।

তাদের অভিযানটা হবে সমুদ্রে ডুবুরীর পোষাকে। সমুদ্রে তারা পর্যবেক্ষণ করবে নানা ধরনের প্রাণী, তাদের স্বভাব, আত্মরক্ষার ও আক্রমণের কৌশল প্রভৃতি। এছাড়াও তাদের কর্মসূচীর মধ্যে আছে বেশ কিছু সামুদ্রিক প্রাণী সংগ্রহ করে আনা। ঠিক হয়েছে প্রায় পাঁচ ঘণ্টা ধরে তারা সমুদ্রের নীচে অনুসন্ধান চালাবে। পরণে থাকবে ডুবুরীর ড্রেস, হাতে থাকবে শক্তিশালী টর্চ, আর একটা ধারাল ছুরি। ছুরিটা অবশ্য তারা ব্যবহার করবে আত্মরক্ষার কাজে। এ ছাড়াও পিঠে থাকবে অক্সিজেনের সিলিণ্ডার, আর পোষাকের আংটার সঙ্গে থাকবে দড়ি বাঁধা। দড়ির অপর প্রান্ত থাকবে জলের ওপরে টুনুকাকুর হাতে, তিনিই সমস্ত ব্যাপারটা জলের উপর থেকে নিয়ন্ত্রণ করবেন।

অভিযানের দিন প্রায় এসে গেল। এত বড় একটা অভিযান তারা করতে যাচ্ছে কিন্তু এর কথা কাউকে বলতে পারছে না। কারণ বাবা বা মার কানে যদি কথাটা পৌঁছায় তবে তাদের সমস্ত প্ল্যানটাই নষ্ট হয়ে যাবে। বাবা-মা নিশ্চয় তাদের এই অভিযানে মত দেবেন না। অভিযানের কথা ভেবে একদিকে তাদের যেমন আনন্দ হচ্ছে অন্যদিকে তেমনি বুক ধড়ফড়ানিও শুরু হয়ে গেছে। দিন যত এগিয়ে আসছে ভয়ও তাদের বেড়ে যাচ্ছে। কিন্তু উপায় কি? এতদূর এগিয়ে তো আর পিছিয়ে আসা যায় না। অগত্য অভিযানের জন্য তারা মানসিক প্রস্তুতি নিতে শুরু করল।

একদিন দুপুরবেলা টুনুকাকু বললেন—সমুদ্রে তোরা তো যাচ্ছিস বিভিন্ন প্রাণীদের সম্বন্ধে জানতে, কাজেই এ বিষয়ে তোদের কিছু জ্ঞান থাকা প্রয়োজন। আজ যখন সময় পেয়েছি, তখন আয় কিছু আলোচনা করি। প্রথমেই বলি সামুদ্রিক প্রাণীদের বাসস্থানের কথা। কিরে কালু তুই তো অনেক বইটই পড়িস, জানিস নাকি এ বিষয়ে? কালু উত্তর করে,—কিছু তো নিশ্চয় জানি, তবে সব কিছু তো জানিনা, তা তুমি যখন বলছ তখন বলই না। টুনুকাকু বলেন, বেশ—তাহলে মন দিয়ে শোন।

গম্ভীর গলায় টুনুকাকু শুরু করলেন—প্রাণীরা সমুদ্রের বিভিন্ন স্তরে বাস করে। বাসস্থানের উপর নির্ভর করে তাদের কয়েকটি ভাগে ভাগ করা হয়েছে। যেমন সমুদ্রের তীরে বসবাসকারী প্রাণীদের বলা হয় littoral, সমুদ্রতলের একশ পঞ্চাশ মিটার নীচে বসবাসকারী প্রাণীদের বলা হয় Pelagic, সমুদ্রের গভীরতম অঞ্চলে বসবাসকারী প্রাণীদের বলা হয় benthic এবং সমুদ্রের উপরিতলে বসবাসকারী প্রাণীদের বলা হয় abyssal। তোরা যখন সমুদ্রের নীচে নামতে থাকবি তখন দেখবি সমুদ্রের এক একটা স্তরে এক এক ধরনের প্রাণী বাস করে। এই সমস্ত প্রাণীরা সব সময়েই তাদের খাদ্য, বাসস্থান ও অস্তিত্বের জন্য পরস্পরের মধ্যে সংগ্রাম করছে। পরিবেশের সঙ্গে খাপ খাওয়ানোর জন্য তাদের দেহেরও নানা রকম পরিবর্তন হয়। কিছু কিছু প্রাণীদের আত্মরক্ষার জন্য দেহের বাইরে একটি চুন নির্মিত খোলক দেখা যায়। শামুক জাতীয় প্রাণীদের এইরকম খোলক দেখা যায়। কিছু কিছু প্রাণী পাথরের তলায় লুকিয়ে

বসবাস কোরে আত্মরক্ষা করে। আবার কিছু কিছু প্রাণী দ্রুত সন্তরনশীল এবং এরা এই ভাবে শত্রুর হাত থেকে রক্ষা পায়। অক্টোপাস হলো এর উদাহরণ। বেলু বলে অক্টোপাস তো মারাত্মক প্রাণী, শুনেছি এরা বাহু দিয়ে জড়িয়ে ধরলে নাকি আর নিস্তার নেই, তাহলে এরা পালাবে কেন? টুনুকাকু বলেন—দূর বোকা, সব প্রাণীই আত্মরক্ষার জন্য প্রথমে পালাবার চেষ্টা করে। পালাতে না পারলে তবেই মরিয়া হয়ে আক্রমণ করে।—এবারে শোন এদের বিষের কথা—

সমুদ্রে বসবাসকারী প্রাণীদের দেহে এক প্রকার বিষাক্ত পদার্থ উৎপন্ন হয় যাকে বলে biotoxin, সমস্ত প্রাণীর দেহেই অবশ্য এই বিষাক্ত পদার্থ থাকে না। বিষাক্ত পদার্থ আছে এমন প্রাণীর দংশন মানুষের মৃত্যু পর্যন্ত ঘটাতে পারে। Biotoxin উৎপন্নকারী প্রাণীদের আবার দুই ভাগে ভাগ করা হয়—একটি ভাগ হলো Poisonous ও অন্য ভাগটি হলো venomous, যে সমস্ত প্রাণীদের দেহে biotoxin থাকে এবং আহারের সঙ্গে ঐ বিষ আমাদের দেহে প্রবেশ কোরে বিষক্রিয়ার সৃষ্টি করে তাদের বলে Poisonous এবং যে সমস্ত প্রাণীরা দংশনের দ্বারা আমাদের দেহে বিষ প্রবেশ করায় তাদের বলে venomous.

একটিপ নস্যি টেনে টুনুকাকু আবার শুরু করেন—সিলেনটেরেটার অন্তর্গত প্রাণীরাই হলো দংশন অঙ্গযুক্ত সরলতম প্রাণী। এরা সাধারণতঃ সমুদ্রে প্রায় এক হাজার মিটার নিচে পাথরের সাথে আবদ্ধ অবস্থায় বাস করে। লিটোকারপাস, প্যানেরিয়া, এগলোফেনিয়া, হেলেসিয়াম প্রভৃতি প্রাণীদের দংশনের খবর জানা গেছে। এগুলির মধ্যে প্রথমোক্ত দুটি ভারতীয় সমুদ্র উপকূলবর্তী স্থানে পাওয়া যায়। এই অঞ্চলের আর একটি প্রাণী হলো সাগর কুসুম। এরাও মানুষকে দংশন করে। টুনুকাকুকে থামিয়ে কালু বলে ওঠে—আপনার বাড়ীতে তো সাগর কুসুম আছে, তাই না? টুনুকাকু বলেন—হ্যাঁ, তুই তো দেখেছিস, ওটাকে আমি সংগ্রহ করেছিলাম দীঘার সমুদ্র থেকে। সে অনেক কাল আগের কথা—কলেজ থেকে গিয়েছিলাম জুলজিকাল এক্সকারশনে, তখনই ওটাকে ধরেছিলাম। তবে ওটাতো অনেক ছোট, ওর থেকে অনেক বড় বড় সাগর কুসুম তোরা দেখবি। যাকগে সে কথা—এবারে শোন ভাসমান সিলেনটেরনস-এর কথা। ফাইসিলিয়া, জেলিফিস প্রভৃতি প্রাণীরা মানুষকে দংশন করতে সক্ষম। এদের মধ্যে সবচেয়ে বিষাক্ত হলো কিউবোমেডুষা—এদের উচ্চতা প্রায় দশ সেন্টিমিটার ও প্রস্থ প্রায় পাঁচ সেন্টিমিটার।

টুনুকাকু প্রশ্ন করেন বেলু বলতো—কেঁচো কি জাতীয় প্রাণী? বেলু বলে—আপনি যে কি প্রশ্ন করেন, কেঁচো অঙ্গুরীমাল প্রাণী—এতো সবাই জানে। হ্যাঁ কেঁচো হলো অঙ্গুরীমাল প্রাণী। এই অঙ্গুরীমাল প্রাণীদের খুব কম সংখ্যকই venomous। ইউরিথো, হারমোডাইস, ইউনিস প্রভৃতি প্রাণীরা venomous বলে জানা গেছে। এরা সাধারণতঃ সমুদ্রের তীরে থেকে পাঁচ হাজার মিটার বা তারও বেশি গভীরতায় বাস করে। এদের দেহ পাঁচ থেকে দশ সেন্টিমিটার মত লম্বা হয়। যদিও ইউনিসের কিছু প্রজাতির দৈর্ঘ্য প্রায় এক মিটার বা তারও বেশি। ইউরিথো ভারতীয় সমুদ্র উপকূলবর্তী স্থানে প্রচুর পাওয়া যায়। এদের দেহ লম্বাটে, চ্যাপ্টা, ধূসর সবুজ বর্ণের ও প্রায় একশ চল্লিশ মিলিমিটার দৈর্ঘ্য যুক্ত। এদের প্যারাপোডিয়াতে সুগঠিত, ফাঁটা বিষযুক্ত সিটা থাকে।

এবারে আসা যাক মোলাস্কা পর্বের অন্তর্গত প্রাণীদের কথায় এদের দেহ অখণ্ডিত, নরম ও শক্ত shell বা খোলকে আবৃত। তবে বেশ কিছু ক্ষেত্রে এই shell লুপ্ত প্রায় বা অনুপস্থিত থাকতে দেখা যায়। এদের অন্তর্গত venomous প্রাণী হলো অক্টোপাস, ললিগো, সেপিয়া, কোনাস প্রভৃতি। অক্টোপাসের আটটি বাহু এবং এদের দৈর্ঘ্য নয় মিটার পর্যন্ত হতে পারে। এরা সমুদ্রতল থেকে প্রায় একশ আশি মিটার নীচে অবস্থান করে। সেপিয়া ও ললিগোর আটটি বাহু ও দুটি লম্বা কর্ষিকা থাকে। এরা মুক্ত সমুদ্র পছন্দ করে।

একাইনোডারমাটার অন্তর্গত প্রাণীদের প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো দেহে কণ্টকের উপস্থিতি। পৃথিবীর সমস্ত সমুদ্রেই এদের পাওয়া যায়। তারা মাছ বা star flsh হলো এদের উদাহরণ। সর্বাপেক্ষা বিষাক্ত তারামাছ হলো অ্যাকানথেস্টার। এদের ব্যাস প্রায় ষাট সেন্টিমিটার ও এদের তের থেকে ষোলটি বাহু থাকে। প্রত্যেকটি বাহুতে লম্বা বিষযুক্ত কাঁটা থাকে। সমুদ্র আর্চিনও বিষাক্ত, এদের বিষাক্ত অঙ্গ হলো পেডিসেলারি ও কাঁটা।

কিরে কালু—চা-টা একটু না হলে আর বক্ বক্ করা যাচ্ছে না, যা মাকে বলে একটু চায়ের ব্যবস্থা কর। কালু লজ্জা পেয়ে বলে—হ্যাঁ, আপনি বসুন আমি এক্ষুনি চা নিয়ে আসছি, মা বোধ হয় টের পাননি আপনি এসেছেন, তাহলে এতক্ষণে নিশ্চয় চা নিয়ে আসতেন। কিন্তু কালুকে আর চা নিয়ে আসতে মার কাছে যেতে হলো না, মা নিজেই চা আর তেলে ভাজা নিয়ে ঘরে ঢুকলেন। মাকে দেখেই টুনুকাকু বললেন—এই যে বৌদি, কালুকে পাঠাচ্ছিলাম চায়ের জন্য, দুজনে মিলে আমাকে ঘা বক্‌বক্ করাচ্ছে, গলাটা যেন শুকিয়ে গেছে। মা হাসতে হাসতে বলেন—তুমিও যেমন পাগল, দুদিন এসেছ কলকাতায়, কোথায় একটু ঘুরে ফিরে বেড়াবে তা না বসে বসে ওদের সঙ্গে বক্‌বক্ করছ। নাও চা-টা খেয়ে নাও, কালুর বাবার ফিরবারও সময় হলো, ওঁ এক্ষুনি এসে যাবে।

চায়ের পেয়ালায় চুমুক দিয়ে টুনুকাকু আবার শুরু করলেন —এবারে তোদের মেরুদণ্ডী প্রাণীদের বিষয়ে কিছু বলব। প্রথমে বলি বিষাক্ত মাছেদের কথা। প্রায় দুশোটিরও বেশী প্রজাতি venomous বলে জানা গেছে। বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই দেখা যায় যে এদের বিষযুক্ত দংশক কাঁটা পৃষ্ঠীয় পাখনাতে অবস্থান করে। এদের মধ্যে বেশ কিছু সমুদ্রের উপরিভাগে বাস করে, আবার বেশ কিছু বাস করে গভীর সমুদ্রে। সময়ে সময়ে এরা আবার সমুদ্র তীরবর্তী বালি বা কাদাতেও থাকে। হাঙর, শঙ্কর মাছ, ডগফিন, স্করপিয়ন প্রভৃতিদের পৃথিবীর প্রায় সব সমুদ্রেই পাওয়া যায়। তবে এদের মধ্যে শংকর মাছ সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ কারণ বিষাক্ত শংকর মাছের দ্বারা মৃত্যুর ঘটনাই বেশী শোনা যায়। এছাড়াও আছে বিভিন্ন সামুদ্রিক সাপ।

বেলু আর কালুর চোখ মুখ দেখে টুনুকাকু বুঝতে পারেন যে দুজনেই প্রচণ্ড ভয় পেয়েছে। কিন্তু দুজনের কেউই ভয়ের কথা প্রকাশ করতে পারছে না, পাছে এক জনের কাছে আর একজন ভীতু বলে পরিগণিত হয়। বেলু প্রশ্ন করে যদি কোন প্রাণী জলের নীচে আমাদের আক্রমণ করে তবে কি করব? টুনুকাকু উত্তর করেন—পালাবার চেষ্টা করবি, যদি পালাতে না পারিস তবে তার সঙ্গে লড়াই করতে হবে। সব সময়েই চেষ্টা করবি physalia বা জেলিফিস-এর সঙ্গে বেশ কিছুটা দূরত্ব বজায় রাখতে, কারণ এদের কর্ষিকা বেশ কয়েকমিটার পর্যন্ত লম্বা হতে পারে। কখনও কখনও কর্ষিকা 36 মিটার পর্যন্ত লম্বা হতে দেখা যায়। হঠাৎই কালু বলে ওঠে—সমুদ্রে তো হাজার হাজার প্রাণী, কতদিকে লক্ষ্য রাখব। টুনুকাকু বলেন সমুদ্রের নীচে নামলে লক্ষ্য তো রাখতেই হবে।

টুনুকাকু বলেন, সামুদ্রিক প্রাণীদের সম্বন্ধে তোদের মোটামুটি জ্ঞান দেওয়া হলো। আজ এই পর্যন্তই থাক। কালকে আলোচনা করবো বড় আকারের কোন অক্টোপাস, তিমি বা হাঙর আক্রমণ করলে কি করা উচিত সে বিষয়ে। কিন্তু ওদের দুজনেরই সমুদ্র অভিযানের শখ মিটে গেছে, ওরা এখন চিন্তা করছে কিভাবে এই অভিযানের হাত থেকে মুক্তি পাওয়া যায়।

বেলু চিন্তা করে কোন অক্টোপাস যদি বাহু দিয়ে জড়িয়ে ধরে তবে বাঁচার আর কোন আশাই থাকবে না। কালুর মনে পড়ে যায় মিউজিয়ামে রাখা তিমির চোয়ালের ঐ বৃহৎ হাড়ের কথা। অতবড় তিমি তাদের মত একশ জন ছেলেকে অনায়াসে একসাথে গিলে ফেলতে পারে। খানিক চিন্তা

করে বেলু বলে ওঠে আচ্ছা টুনুকাকু এই ধরনের অভিযানের আগে একবার ডাক্তারী পরীক্ষা করা উচিত নয় কি? শুনেছি এই ধরনের অভিযানের আগে অভিযানকারীর স্বাস্থ্য ভাল-ভাবে পরীক্ষা করা হয়। তবে তো আমাদেরও একবার ডাক্তারী পরীক্ষা করানো দরকার। মনে হয় আমার শরীরটা ঠিক নেই। কালু বলে ওঠে আমার শরীর ফিট আছে কি করে বুঝলি। আমিও তো আনফিট হতে পারি। বেলু বলে, আমি দুজনের কথাই বলছি, আমার একার কথাতো বলছি না। টুনুকাকু বুঝতে পারেন ওদের অভিযানের শখ মিটেছে। তবুও গম্ভীর গলায় বলেন, নিশ্চয়, ডাক্তারী পরীক্ষাতো করতেই হবে। আর একটা জিনিসও তোমাদের করা উচিত তা হচ্ছে, এত বড় একটা অভিযানের আগে বাবা-মার আশীর্বাদ নেওয়া। দুজনেই বাবা-মার কাছে গিয়ে তোমাদের অভিযানের কথা বলে তাঁদের আশীর্বাদ নাওগে। কালু বলে উঠল—ওরে বাবা, বাবার মত নেওয়া তো দূরের কথা বাবাকে বলতেই পারব না, বাবা শুনলেই চেঁচামেচি শুরু করে দেবেন, বাবার রাগ তো জানেন, রেগে গেলে কিছুই জ্ঞান থাকে না। বেলু বলে—তাহলে—আমি বলি কি অভিযানটা এখন বন্ধ থাক। আমরা আর একটু বড় হই, তার পরে আবার চিন্তা করা যাবে অভিযানটার কথা।

জীব বিদ্যার শিক্ষক, মর্ডান স্কুল, পার্ক সার্কাস, কলি-17।

মে দিবসের আহ্বান

যুদ্ধের বিরুদ্ধে শান্তির সপক্ষে

গণতন্ত্র, ট্রেড ইউনিয়ন ও অর্জিত অধিকার রক্ষার সংগ্রামে,
স্বৈরতন্ত্র, বিচ্ছিন্নতাবাদ ও সাম্প্রদায়িকতার প্রতিরোধে,
শ্রমিক কর্মচারী ও মেহনতী মানুষের দৃঢ় ঐক্য গড়ে তুলুন।

॥ পশ্চিমবঙ্গ সরকার ॥

আই. সি. এ. ২২৯৩/৮৯

কলকাতার পরিবেশ

কিন্নর রায়

'টেন কমাণ্ডমেণ্টস' ছবির কথাটি অনেকেরই মনে আছে। র‍্যামেসিসের প্রাসাদে যে কালো বিষাক্ত ধোঁয়া নেমে এসেছিল, ছবির পর্দায় দেখা সেই রাতটির স্মৃতি এখনও অনেকের মন থেকেই মুছে যায় নি। ফারাওয়ের বিশাল প্রাসাদ, রাত্রির রহস্যময় অন্ধকার, আকাশে ভৌতিক চাঁদ এবং নেমে আসা কালো বিষাক্ত ধোঁয়া—স্মৃতি থেকে এই দৃশ্য ফিরিয়ে আনলে এখনও গা ছম ছম করে ওঠে। ধোঁয়া ফারাওয়ের ছেলেকে খুঁজছিল। আর এ কলকাতায় পোড়া ডিজেল পেট্রল আর মবিলের ধোঁয়া রোজই আমাদের তাড়া করছে। গ্রাস করছে। নাক বা গলা দিয়ে সর্দি উঠে এলে দেখি তার ভেতর কালো কালো চিহ্ন। বাতাসে বিষের স্বাক্ষর।

কিছুদিন আগেও টি.ভি-তে একটি বিজ্ঞাপনে দেখানো হতো, কয়েক বছর পর কলকাতার রাস্তা দিয়ে গ্যাস মুখোশ পরে হেঁটে যেতে হবে। এই ভাবী-দিনটির কল্পনার কথা ভাবলে শিউরে উঠতে হয়। সত্যি সত্যি কলকারখানা এবং গাড়ির ধোঁয়ায় এ শহরের বাতাস যে ভাবে ভয়াবহ হয়ে উঠছে, তাতে গ্যাস মুখোশ হয়ত প্রত্যেককেই পরতে হবে। কয়েকদিন আগে দুপুর রোদে পার্কস্ট্রিটে এক বিদেশীকে নাকে-মুখে ঠুলি লাগিয়ে চলতে দেখেছি। বাতাস দূষণের আতঙ্কই কি এর কারণ ?

দিন দিন কোথায় চলে যাচ্ছি আমরা ! একটু একটু করে কোন অতলে ! কলকাতার বাতাস ক্রমশ শ্বাস নেয়ার অযোগ্য হয়ে উঠছে। আকাশ চাটা হাই রাইজ বিল্ডিং নামিয়ে দিচ্ছে এই শহরে মাটির নিচে জমে থাকা জলের স্তর। ক্রমাগত বৃক্ষ নিধনের ফলে সবুজ নেই, ছায়া নেই, বৃষ্টিবতী মেঘ উড়ে আসে না। পাখি দেখা যায় না, তেমন ভাবে এ শহরে। এমনকি চিড়িয়াখানায় বিশাল জলাধারটিতে হিমালয়ের পায়ের কাছ থেকে, বা সুদূর সাইবেরিয়া থেকে যে পরিযায়ী পাখিরা উড়ে আসত. সেই সব পিনটেল, বা অন্যান্য হাঁসেদের এবারে দেখা যায় নি। তারা অনেকটা দূরে সাঁতরাগাছির ঝিলে নেমেছে। চিড়িয়াখানার শীতের সকালগুলি মুখরিত হয়ে ওঠে নি তাদের কলকণ্ঠে। ঘুড়িতে বঁড়শি লাগানো চোরা শিকারী, আকাশ ছোঁয়া হোটেল, বাড়ি গাড়ির অসহ্য হর্ন, বাতাস-দূষণ এইসব শীতের অতিথিদের নির্বাসন দিয়েছে।

কলকাতার বাতাসে যে অসুস্থ ধোঁয়াশার ক্রমাগত আক্রমণ তা আরও বেশি বোঝা যায় শীত এলে। কুয়াশার গায়ে জুড়ে যায় ধোঁয়াশার পর্দা। বাতাস ভারি হয়ে ওঠে, নিঃশ্বাস নিতে রীতিমতো পরিশ্রম করতে হয়।

সাধারণত বাতাসে 77 দশমিক 12 শতাংশ নাইট্রোজেন, 20 দশমিক 65 শতাংশ অক্সিজেন, 1 দশমিক 41 শতাংশ জলীয় বাষ্প, দশমিক 03 শতাংশ কার্বন-ডাই-অক্সাইড থাকে। বাকিটা নিষ্ক্রিয় গ্যাস। এই হিসেবের হেরফের হলেই বায়ু দূষিত হয়ে পড়ে। কলকাতার বাতাসে দূষণের পরিমাণ বিপদ সীমা ছাড়িয়ে যাচ্ছে। একজন মানুষ দিনে গড়ে যতবার শ্বাস নেন ও ছাড়েন, তাতে সারা দিনে 16 কিলোগ্রাম বাতাস শরীরে গ্রহণ করে থাকেন। এর শতকরা 80 ভাগ অক্সিজেন। স্বাভাবিক ভাবে বাঁচতে গেলে এই অক্সিজেনের পরিমাণ খুবই জরুরি।

সম্প্রতি এক সমীক্ষায় দেখা গেছে, কলকাতা ও রাজ্যের শিল্পাঞ্চলের বাতাসে কার্বন-ডাই-অক্সাইড বাড়ছে। তার মানে বাতাসে অক্সিজেন কমছে। একযুগ আগেও কলকাতার

শিল্পাঞ্চলের বাতাসে কার্বনডাই-অক্সাইড বাড়ছে

বাতাসে অক্সিজেনের পরিমাণ ছিল 19 দশমিক 90 শতাংশ। এখন তা কমে দাঁড়িয়েছে 17 দশমিক পঞ্চাশ শতাংশ। অক্সিজেন কমার কারণ কলকাতার কাছাকাছি শিল্প এলাকায় কল-কারখানার চিমনি থেকে উগরে দেয়া বিষ-ধোঁয়া। আর সবুজ কমছে, কমে যাচ্ছে কলকাতা ও তার আশেপাশের উন্মুক্ত জমি। ফলে বাতাসে অক্সিজেন হ্রাস পাচ্ছে।

যে কোনো আধুনিক শহরে মাথা পিছু উন্মুক্ত জমি থাকা উচিত 250 বর্গফুট। লণ্ডন ও বিশ্বের অন্যান্য বড় শহরে এই নিয়ম মেনে চলা হয় কঠোরভাবে। কলকাতায় এখন মাথা পিছু উন্মুক্ত জমির পরিমাণ মাত্র 20 বর্গফুট। কলকাতাকে ইট-কাঠ-পাথর গ্রাস করে নিয়েছে লবণ হ্রদের জলাভূমি, ইস্টার্ন বাইপাসের ফাঁকা অঞ্চল। ইস্টার্ন বাই-পাসের দুপাশে গড়ে উঠেছে বে-আইনি বসতি।

কলকাতায় পার্ক-ময়দান এসব নিয়ে 1500 একর খালি জমি ছিল। তার কিছুটা নানাভাবে লোপাট হয়ে গেছে। নতুন পার্ক তৈরি হওয়া দূরে থাক, পুরনো পার্কের অনেকটা জায়গাই বেদখল। অতিথি অভ্যাগত নিয়ে 60 লক্ষ মানুষের বাস এই কলকাতায়। 82 বর্গকিলোমিটার আয়তনের কলকাতায় যে 1500 একর উন্মুক্ত জমির কথা বলা হয়েছে, তার মধ্যে 750 একর জুড়ে ময়দান। দক্ষিণ কলকাতার রবীন্দ্র সরোবর, বেলেঘাটার সুভাষ সরোবর বিস্তৃত 400 একর জমি নিয়ে। বাকি 300 একর জমি নিয়ে কলকাতার আছে 104টি পার্ক। আর আছে চিড়িয়াখানা, এগ্রিহর্টি-কালচার, টালিগঞ্জের রেসকোর্স, গল্ফগ্রিন। পার্কগুলোর মধ্যে একমাত্র উত্তর কলকাতার দেশবন্ধু পার্ক একটু বড় মাপের—18 একর। বাকিরা 3 থেকে 6 একর।

এই হিসেবে এখন রীতিমতো গোলমাল হয়ে গেছে। পার্কগুলোর বেশ কিছু অংশ, এমন কি ময়দানও দখল হয়ে গেছে। পাতাল রেল, চক্ররেল, দ্বিতীয় হুগলী সেতু দখল করে নিয়েছে ময়দানের এক দশমাংশ জমির সবুজ। উত্তর আর দক্ষিণ কলকাতার অন্তত দশটি পার্কে তৈরি হয়েছে পাতাল রেলের গুদাম, অফিস-ঘর। এছাড়া বহু পার্কে তৈরি হয়েছে ক্লাব ঘর, নাটমঞ্চ নয়তো সরকারি গুদাম। 1947-এর 15 আগস্টের পর কলকাতায় গোটা তিনেক মাত্র নতুন পার্ক হয়েছে। যে হারে মানুষ বেড়েছে, সে তুলনায় এ অতি সামান্য। বাচ্চাদের বেড়াবার, খেলার মাঠ নেই। ফলে গলি-ক্রিকেট, গলি-ফুটবল।

চিড়িয়াখানার জমি ছাঁটাই হয়ে তৈরী হচ্ছে পাঁচতারা হোটেল। কলকাতার বুকে যে ক'টি জলাশয় ছিল, তারা ক্রমেই কমে আসছে। এ শহরের পরিবেশকে কে বাঁচাবে? কলকাতার পুরসভা আমাদের এক হিসেবে জানালেন, এই শহরে 1974-75 সালে 23 হাজার 907 জন মানুষ মারা গেছেন। এদের মধ্যে শ্বাস কষ্টজনিত অসুখে মারা গেছেন 4 হাজার 622 জন। এখন এই অংক বাড়তির দিকে। গত পাঁচ বছরে শ্বাস-কষ্টের অসুখ বেড়েছে। সংক্রামিত হচ্ছে শিশুদের ভেতরেও। কলকাতার বাসিন্দা শিশুর কাছে হাঁপানি 'খুবই সাধারণ অসুখ' হয়ে উঠেছে।

বিষাক্ত ধোঁয়া ও গ্যাস প্রতি ঘণ্টায় কলকাতার বাতাসের 35 হাজার লিটার অক্সিজেন দূষিত করছে। এই ধোঁয়া আর গ্যাস গলগল করে উঠে আসে কারখানার চিমনি, রান্নার জন্যে ব্যবহার করা কয়লার উনোন আর পোড়া পেট্রল ডিজেল থেকে। ভারি বাতাস টেনে নিতে কষ্ট হয়।

এছাড়া কলকাতার গা ঘেঁষে আছে দুটি তাপ-বিদ্যুৎ কেন্দ্র। তাদের ধোঁয়ায় ধোঁয়ায় বিষিয়ে উঠছে কলকাতার বাতাস। কলকাতা ও তার আশেপাশের 6 হাজর কল-কারখানার সাড়ে 27 হাজার ফার্নেস থেকে চিমনির মুখ দিয়ে প্রতিদিন 396 টন বিষাক্ত ধোঁয়া মিশছে বাতাসে। এর সঙ্গে আছে 60 হাজার রান্নার উনোনের ধোঁয়া। ইঞ্জিনিয়ারিং ইণ্ডাস্ট্রিজের এক সমীক্ষায় বলা হয়েছে, কলকাতার প্রতি বর্গমাইল বাতাসে দৈনিক 671 মেট্রিক টন দূষিত পদার্থ মিশছে। বিশ্ব-স্বাস্থ্য সংস্থার হিসেব অনুযায়ী বাতাসে প্রতি দশ লক্ষ অনুকণায় ষাটের বেশি কার্বন মনো অক্সাইড থাকা উচিত নয়। কলকাতায় এই হিসেবে বিস্তর গরমিল। এখানকার বাতাসে কার্বন মনো অক্সাইডের পরিমাণ—শ্যামবাজারে 70, ব্রাবোর্ন রোডে 65, শিয়ালদহে 62।

এক সময় জঞ্জাল বয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্যে কলকাতায় ট্রেনের ব্যবস্থা ছিল। অনেক পরে এসেছে পুরসভার লরি। কলকাতায় দৈনিক জঞ্জাল জমে 2400 টন। মাথা পিছু মাত্র 500 গ্রাম। তবু একে পরিষ্কার করে সাফ-সুতরো করা যায় না। 'ময়লা ছুঁইলে শাস্তি পাইবে' লেখা ঢেউ টিনের ঘেরা জঞ্জাল ফেলার জায়গাগুলি অদৃশ্য। তার বদলে এসেছে সিমেন্টের বাঁধানো ময়লা ফেলার জায়গা। তবু জঞ্জালের পাহাড় জমে যায়। এই ময়লা সরিয়ে ফেলার জন্যে দরকার দৈনিক 200টি লরি। পুরসভার আছে 150টি লরি। তার মধ্যে চালু আছে 130টি। ফলে দিনে 1700 টনের বেশি জঞ্জাল ফেলা যায় না। এই জমা জঞ্জালের দূষিত গ্যাস মেশে বাতাসে। কলকাতার খাটা পায়খানা থেকে প্রতিদিন 3 হাজার টন ময়লা অপসারণ করা দরকার। তাও হচ্ছে না। এইসব ময়লা থেকে দূষিত গ্যাস বেরিয়ে বাতাসে মেশে। ধাপার মাঠের জমা আবর্জনা থেকে বেরিয়ে আসা দূষিত গ্যাস কলকাতার বাতাসের 6 শতাংশকে নষ্ট করছে।

তাপ-বিদ্যুৎ কেন্দ্রগুলির ক'টিতে গ্যাস দূষণমুক্ত করার ব্যবস্থা কার্যকর আছে? মনে রাখা ভালো, তাপ-বিদ্যুৎ

কেন্দ্রগুলির ধোঁয়া সবচাইতে বিষাক্ত। পরমাণু বিদ্যুৎ কেন্দ্রগুলি থেকেও সমান বিপদ। সোভিয়েত ইউনিয়নের চেরনোবিল দুর্ঘটনা তার জ্বলন্ত প্রমাণ।

রাজ্য সরকার ও কেন্দ্রীয় সরকার দূষণ প্রতিরোধে আইনের পর আইন করে চলেছেন। দূষণের অপরাধে সরকারি বে-সরকারি কলকারখানায় নোটিশ জারি করা হচ্ছে। আদালতে মামলা হচ্ছে। কিন্তু কোনোই ফলাফল চোখে পড়ছে না। কলকাতায় তো বটেই, দুর্গাপুরেও একই হাল। ইস্পাত কারখানার কোক-ওভেন প্ল্যান্টটি একেবারে যেন মৃত্যুপুরী। বেঞ্জিন, বেঞ্জন কার্বন আক্সাইড, সালফার অক্সাইড অ্যামোনিয়া —এইসব গ্যাসের কবলে পড়ে শ্রমিকেরা, সাধারণ মানুষেরা শ্বাসকষ্টে ভোগেন। এভাবে চলতে থাকলে আমাদের চারপাশে গড়ে উঠবে অগনিত ভোপাল ট্র্যাজেডি।

বাতাসে যেমন বিষ মিশছে, তেমনই বিষ মিশছে জলে। কারখানার বর্জ্য পদার্থ বিপজ্জনকভাবে মিশছে গঙ্গার জলে। বাড়ছে গঙ্গা দূষণ। গঙ্গার জল খাওয়া তো দূরের কথা, স্নানেরও অযোগ্য। কারখানার তেলকালি তো আছেই। আর আছে গোরু-মোষ, কুকুর চান করানো বাসি ফুল-মালা মৃত পশু এমনকি মরা মানুষও ভাসিয়ে দেয়া গঙ্গার জলে। আছে শৌচাদি ও প্রাতঃকৃত্যাদি। শুধু কলকাতার গঙ্গাই নয়, সেই সুদূর এলাহাবাদ আর কাশীতেও সম্প্রতি ঘুরে এসে একই অভিজ্ঞতা হয়েছে। কাশীতে খুব বড় করে নেয়া হয়েছে গঙ্গা শোধনের পরিকল্পনা। কিন্তু তার প্রতিটি ঘাটেই প্রায় কাপড় কাচা, গোরু-মোষ চান করানো। শহরের আবর্জনা মিশছে গঙ্গার জলে। সরকার কত করবে, কত দিক দেখবে? মানুষকে সচেতন হতে হবে।

গঙ্গার জল দূষণের মাত্রা বিপজ্জনকভাবে বাড়ছে। 50 মিলি লিটার জলে 100 একক জীবাণু থাকতে পারে। হালফিল এই জীবাণুর সংখ্যা 250 একক ছাড়িয়ে গেছে। পাল-পার্বনে গঙ্গাসাগর মেলর সময় ভয়ঙ্করভাবে বেড়ে যায় জীবাণু। গঙ্গা আর হুগলি নদীর জল দূষণ শুরু হয়েছে অনেক আগে থেকেই। হুগলি নদীর দুপাশে যে অসংখ্য কল-কারখানা আছে তার দূষিত বর্জ্য 346টি নালা দিয়ে জলে মেশে। কলকাতার আশেপাশে 93টি পুরসভার মাত্র দুটির নিজস্ব পয়ঃপ্রণালীর ব্যবস্থা আছে। বাকিদের ভরসা গঙ্গা। এই ভাবে প্রতিদিন হুগলি নদীর জলে মিশছে 3 হাজার টন দূষিত পদার্থ। 1971-এ হুগলি নদীর তীরে মোট শহরের সংখ্যা ছিল 198, এখন তা বেড়ে হয়েছে 242। সেই সময় লোকসংখ্যা ছিল প্রায় 3 কোটি। এখন তা বেড়ে দাঁড়িয়েছে 4 কোটি। ফলে গঙ্গায় দূষণও বেড়েছে।

সেন্টার ফর দ্য স্টাডি অফ প্ল্যান অ্যাণ্ড এনভায়রমেন্ট-এর একটি রিপোর্ট থেকে জানা যাচ্ছে, গঙ্গা দূষিত হয়ে পড়ছে কল-কারখানা, কৃষিকাজে ব্যবহৃত সার, মানুষ ও জীব-জন্তুর মল থেকে। একটি উদাহরণ: বরানগর অঞ্চলের একটি কারখানা দিনে 8350 লিটার দূষিত জল গঙ্গায় ফেলে। এর মধ্যে কারখানা চত্বরের কোয়াটার্সের জল 8100 লিটার, আর কারখানার জল 250 লিটার। হাওড়া, 24-পরগণা, কলকাতা থেকে যথাক্রমে 2 হাজার 301, 67 হাজার 104 এবং 29 হাজার 802 কিলোগ্রাম দূষিত পদার্থ জলের সঙ্গে মিশ্রিত অবস্থায় প্রতিদিন গঙ্গায় এসে পড়ে। বছরে প্রায় 140 থেকে 200 টন মৃতদেহ জলে ভাসানো হয়। ছাই এসে পড়ে 200 থেকে 300 টন। জমিতে যে সার ব্যবহার করা হয়, তার উপাদান নাইট্রোজেন, ফসফরাস ও পটাসিয়াম দৈনিক হাজার হাজার টন মাটি থেকে গঙ্গায় এসে পড়ে। এই বিষ ছড়ায় গ্রামাঞ্চলের পুকুরে নদী আর দীঘিতেও। মাছ মরে কখনও কখনও। গঙ্গার থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয় রুপোলী ইলিশ।

বাতাস আর জল দূষণ ছাড়াও আছে শব্দ দূষণ। এর শিকার কলকাতা সহ বড় শহরগুলি এবং শিল্পাঞ্চল। সম্প্রতি কয়েক বছর কলকাতায় বধির মানুষের সংখ্যা বাড়ছে। ইণ্ডিয়ান কাউন্সিল অব মেডিকেল রিসার্চের এক সমীক্ষায় দেখা যায়, শব্দের প্রহারে দিল্লীতে কালা হয়ে পড়েছেন শতকরা 9, 5 জন, মাদ্রাজে ও কলকাতায় এই হিসেব শতকরা 10 জন করে।

এয়ার হর্ন, বাজি ছাড়াও মাইকের উপদ্রব কলকাতার শব্দ দূষণের একটি মূল কেন্দ্রবিন্দু। যে কোনো পুজো বা ধর্মীয় উৎসব, বিবাহ, পৈতে, অন্নপ্রাশন, শ্রাদ্ধ সবেতেই মাইকের অত্যাচার। প্রচণ্ড শব্দে রেডিও, টেপরেকর্ডার চালু করে শোনার রীতি কলকাতায় এখনও আছে। সঙ্গে টি.ভি-র দৌরাত্ম্য। গভীর রাতের সিনেমা বা সিরিয়াল, তার গাঁক গাঁক শব্দটি গিয়ে পাশের বাড়ির মানুষটিকে যে নিদ্রাহীন করে দিতে পারে, এ বোধ অনেকেরই নেই।

সাম্প্রতিক এক সমীক্ষায় দেখা গেছে পরিবেশ দূষণে কলকাতার 20 শতাংশ মানুষের স্মৃতিশক্তি নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। শ্রবণ ক্ষমতা হ্রাস পেয়েছে 40 শতাংশ নগরবাসীর। তবু বোমা পটকা-ফাটানো, রাজনৈতিক বোমাবাজী, বীভৎস হর্নের শব্দ, মাইকের তীব্র চিৎকার কমে না।

একটি গাছ, একটি প্রাণ

সরকারি প্রচারের ফলে 'একটি গাছ একটি প্রাণ' এই শ্লোগানটি এখন আমাদের পরিচিতির গণ্ডীর মধ্যে। দেয়ালে ট্রাম-বাসে পোস্টারও দেখা যায়, এই শ্লোগান সহ—অরণ্য সপ্তাহের সময়ে। তবু ক্রমাগত অরণ্য হননের ফলে প্রাকৃতিক ভারসাম্য নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। প্রকৃতি বিজ্ঞানীদের মতে যে কোনো দেশের আয়তনের 33 শতাংশ বনাঞ্চল থাকা দরকার। না হলে নষ্ট হবে প্রাকৃতিক ভারসাম্য। পশ্চিমবঙ্গে তার আয়তনের 13 শতাংশ বনাঞ্চল।

আমরা সকলেই জানি. গাছ বাতাসে অক্সিজেন বিলিয়ে দিয়ে দূষিত কার্বন-ডাই-অক্সাইড টেনে নেয়। একটি গাছ 50 বছরে যত অক্সিজেন বিলিয়ে দেয়, এখনকার হিসেবে তার দাম 15 হাজার 700 টাকা। কোনো কোনো গাছের থেকে তৈরি হয় ওষুধ। হিসেব করে দেখা গেছে পঞ্চাশ বছরের একটি গাছ পঞ্চাশ হাজার টাকারও বেশি সম্পদ দেয় মানুষকে।

তবু ইদানীং কলকাতার ফুটপাতে ফুল ফোটাচ্ছেন কিছু যুবক। কলকাতার উত্তরে দক্ষিণে তাদের স্বপ্ন কোথাও কোথাও ফুল হয়ে ফুটে উঠতে দেখছি। এটুকুই আশার কথা। সরকারি উদ্যোগেও বন-মহোৎসব উপলক্ষ্যে গাছ পোঁতা, গাছের চারা বিতরণ হচ্ছে।

প্রাকৃতিক ভারসাম্য বজায় রাখতে বৃক্ষ অন্যতম সহায়ক ভূমিকা নেয়। গাছ আমাদের বন্ধু, 'একটি গাছ একটি প্রাণ'—একথাটি যেন ভুলে না যাই।

লেখাটি তৈরিতে 'যুগান্তর'-এর সাংবাদিক অমিতাভ চক্রবর্তীর সাহায্য নেওয়া হয়েছে। ছবি : শুভেন্দু ঘোষ।

1এ মুখার্জি পাড়া লেন. কলকাতা-700026

পরিবেশ পরিষেবার প্রতিশ্রুতি ও প্রতিধ্বনি

আমাদের আবেদন—

(১) পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নভাবে জীবনযাপন করুন।

(২) জল প্রকৃতির অমূল্য সম্পদ, কাজেই প্রাকৃতিক জলসম্পদ সংরক্ষণ করুন।

(৩) নদী, নালা, খাল, বিল প্রভৃতি জলের উৎসগুলিতে যাতে কোনরকম নোংরা আবর্জনা-বাহী জল না মেশে সেদিকে নজর রাখবেন।

(৪) কলকারখানাগুলি থেকে নির্গত রাসায়নিক কিংবা অন্যান্য দূষিত পদার্থ যাতে জলের উৎসে না ফেলা হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখবেন।

(৫) বিশুদ্ধ জল পান করবেন।

(৬) লোকালয় থেকে দূরে যাতে কলকারখানা স্থাপিত হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখবেন। প্রয়োজনে পঞ্চায়েত কিংবা দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদকে জানাবেন।

(৭) কলকারখানায় যাতে বায়ুদূষণ নিবারক সাজ-সরঞ্জাম এবং চিমনি ব্যবহৃত হয় সেদিকে নজর রাখবেন।

(৮) অযথা চিৎকার করে কিংবা মাইক বাজিয়ে কিংবা যানবাহনে এয়ারহর্ন বাজিয়ে কিংবা বেশী শব্দের বাজী, পটকা ফুটিয়ে শব্দদূষণ করবেন না।

(৯) গাছপালা মানুষের পরম বন্ধু। তাই পরিবেশ দূষণ রোধে বৃক্ষরোপন একান্ত কর্তব্য। শুধু গাছ লাগানোই নয়, স্বার্থের বশে যাতে কেউ গাছ না কাটে সেদিকে নজর রাখবেন।

(১০) পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষার জন্য বন্যপ্রাণী, পাখী, কীট-পতঙ্গ রক্ষা করবেন।

পশ্চিমবঙ্গ দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদ ১০, ক্যামাক স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০০১৭

আর্জেন্টিনার সাগর তীর। জানুয়ারীর গুমোট রাতে
নোঙর ফেলে আছে মুক্তাসন্ধানী জাহাজ - জেলিফিস।
ডেকের উপর এক পাশে বসে এক রেড ইন্ডিয়ান - বালথাজার।
আলেকজান্দর বেলায়েভের
কাহিনী
অবলম্বনে
উভচর মানব
বাণীরূপ - অনিল কর্মকার • চিত্ররূপ - গৌতম কর্মকার
সারাটা জীবন সমুদ্রের উপরেই
কেটে গেল। জানি না আর কত
দিন এভাবে চলবে।
একি। সমুদ্রের মাঝখানে এমন নিশুতি রাতে এখন শাঁখ
বাজায় কে? তবে কি...!
সাবধান হতে হবে।

ডেকের ধারে ছুটে গেল বালথাজার--
সে--নিশ্চয় সে-দরিয়ার দানো।
সর্বনাশ! তাহলে উপায়?
বুঁউউউউ...
এখানে আর থাকা চলবে না!
বুঁউউউউ...
হাঙরের চেয়েও ও সাংঘাতিক।
উঠে এলেন জাহাজের ক্যাপ্টেন পেদ্রো জুরিতা।
কী--কী সাংঘাতিক?
আমরা ওর আওয়াজ শুনলাম-দরিয়ার দানোর। শিগগির এখান থেকে সরে পড়া দরকার।
ঠিক আছে, চুলোয় যা তোরা, আর তোদের ঐ দানো। যত্তো সব গাঁজাখুরি।
না হুজুর, সব সত্যি। আমরা তাঁর শাঁখের আওয়াজ শুনেছি। সামনে ভীষণ বিপদ!
কাল ভোরেই তাহলে নোঙর তোলা হবে।
না হলে কিন্তু তীরে গিয়ে আমরা পায়ে হেঁটেই রওনা দেবো সবাই-বুয়েনস আইরেস।
উনি সমুদ্রের দেবতা। হাজার বছরে একবার করে দেখা দেন পৃথিবীতে ন্যায়ের রাজ্য প্রতিষ্ঠা করবার জন্যে।

দরিয়ার দানোকে এখনো কেউ দেখেনি -শুধু গুজব ছড়াচ্ছে। মনে হয়। কিন্তু খবরের কাগজেও কিছু যেন দেখে-ছিলাম ...

হ্যাঁ, ঠিক - এই তো !
পাদ্রীদের বক্তব্য : ওটা দরিয়ার দানো। লোকে পবিত্র ক্যাথলিক গির্জাকে ভুলে যাচ্ছে, এই ও দেখা দিতে শুরু করেছে।

রেড ইণ্ডিয়ানদের ধারণা : উনি সমুদ্রের দেবতা। পৃথিবীকে পাপ থেকে মুক্ত করবার জন্যে হাজার বছরে উনি এক বার করে উঠে আসেন সমুদ্রের গভীর থেকে।
হ্যাঁ, বালথাজার এ কথাই সেদিন বলেছিল বটে !

বিতর্কের মীমাংসার জন্যে একটা বৈজ্ঞানিক অভিযানও প্রেরণ করা হয়েছিল। দরিয়ার দানোর ফেলে যাওয়া অনেক চিহ্ন তাঁরা দেখেছেন কিন্তু দানোর সাক্ষাৎ পাননি।

আশ্চর্য ব্যাপার ! এ কেমন করে সম্ভব ? দানো যদি আজ এখানে, তবে পরের দিন শোনা যায় পঞ্চাশ মাইল দূরে। এতো দ্রুত তার বেগ ? কোনও মানুষ কি তা পারে ?

হ্যাঁ ...
সর্বনাশ হয়েছে !
নাবিকদের চিৎকার কী হেন আবার ? দানো কি তবে আক্রমণ করলো নাকি !

রাতের বেলা জাহাজের সঙ্গে বাঁধা ছিল যে নৌকাগুলো, তার সব কাটা – ঐ দেখুন – কেমন এলোমেলো হয়ে সমুদ্রের উপর নাচছে।
সত্যি, ভয়ানক ব্যাপার।
তা তো বুঝলাম, কিন্তু কে এমন করলে?
কে আবার, দরিয়ার দানো। সে চায়না আমরা এখানে থাকি।
শিগগির নোঙর তোলার হুকুম দিন ক্যাপ্টেন।
বেশ, তবে তাই হোক।
এখন চলো বুয়েনস আইরেসের বিশ মাইল দক্ষিণে। তার আগে সব নৌকাগুলো বেঁধে আনো।
অসম্ভব! দানোর থাবার মধ্যে যেতে পারবো না।
তাহলে মর!
ঠিক আছে, আমি যাচ্ছি। গোটা জীবনটা তো ডুবুরী হয়েই কাটালাম। তা হাঙরের পেটে যখন যাইনি তখন দানোও আমাকে ছোঁবে না।
পোষাক খুলেই সমুদ্রের উপর ঝাঁপিয়ে পড়লো বালথাজার।
খানিক পরেই পৌঁছে গেল আমনের নৌকাটায়।
দড়িটা ছুরি দিয়ে কাটা হয়েছে ক্যাপ্টেন। মনে হয় – ধারালো ক্ষুর দিয়ে।
দানো তাহলে জন্তু নয় – মানুষ।

আমরা ও পরিবেশ

তেজস্ক্রিয়তা ও পরিবেশ দূষণ

গোপাল কর

1898 খ্রীঃ মাদামকুরী ও তার স্বামী ইউরেনিয়ামের একটি খনিজ পিচব্লেন্ড থেকে রেডিয়াম ও পোলোনিয়াম আবিষ্কার করেন। এর ভয়াবহ পরিণতি হয়তো অনুমান করে যাননি। আজ গোটা বিশ্ব জুড়ে সমগ্রদেশ এই তেজস্ক্রিয় মৌলের দৌলতে হিংসায় মত্ত।

কয়েকটি মহৎ শক্তি যথেচ্ছ পারমাণবিক বিস্ফোরণ সম্পর্কিত পরীক্ষা-নিরীক্ষায় মেতে উঠেছে। ফলে তেজস্ক্রিয় রশ্মি বিকিরণের মাধ্যমে জল, বায়ু ও মাটি বিষিয়ে যাবার মারাত্মক সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে। পরমাণু বোমা থেকে আরও মারাত্মক হাইড্রোজেন বোমারও অধিকারী বিশ্বের বেশ কয়েকটি দেশ। কাজেই মনুষ্য সমাজের সামনেই বিপদের সম্ভাবনা।

1954 সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র প্রশান্ত মহাসাগরে হাইড্রোজেন বোমা নিয়ে পরীক্ষা চালানোয় ঐ মহাসাগরের জল দুষিত হয়ে পড়ে। যদিও 1963 সালে সম্পাদিত একটি আন্তর্জাতিক চুক্তি অনুযায়ী বায়ুমণ্ডলে, মহাশূন্য বা জলের নীচে পারমাণবিক অস্ত্র পরীক্ষা নিষিদ্ধ হয়েছে। তবুও দুঃখের বিষয় দু'একটা দেশ এই চুক্তিকে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখিয়ে সমুদ্র জলের নীচে, মহাকাশে বা স্থলভাগেও নিয়মিত পরীক্ষা নিরীক্ষা করে চলেছে। এ ছাড়া শান্তির কাজে ব্যবহারের উদ্দেশ্যে পারমাণবিক চুল্লী গড়ে তুললেও যথাযথ সতর্কতা না নিয়ে সমুদ্রে বা যত্রতত্র পরিত্যাজ্য হলে জল মাটি বিষিয়ে যেতে পারে। তেজস্ক্রিয় রশ্মি মানবের দেহে প্রবেশ করলে দেখা যায় মিউটেশন, যার ফলে পরবর্তী প্রজন্ম হয়ে উঠে বিকলাঙ্গ, কানা বা খোড়া, উদাহরণ স্বরূপ তেজস্ক্রিয় পদার্থ 90-এর সংখ্যার স্টনসিয়াম (90Sr) দেহে প্রবিষ্ট হলে হাড়ের মজ্জায় ঢুকে অস্থি টিউমার বা অস্থি ক্যানসার বা লিউকেমিয়া এই সব মারাত্মক ব্যাধির সৃষ্টি হয়, এবং মারাও যায় প্রচুর লোক। এমনও হতে পারে ছাগল, গরু মোষ ইত্যাদি মাঠে চরবার সময় হয়তো 90sr মিশ্রিত ঘাস খেয়েনিল। মানুষ হয়তো এই সবের মাখন বা দুধ খেল। তাতেই মানুষ ঐ সব ব্যাধিতে আক্রান্ত হতে পারে বলে বৈজ্ঞানিকের ধারণা। কাজেই সারা পৃথিবী জুড়েই পারমাণবিক বিস্ফেরণ সংক্রান্ত পরীক্ষা-নিরীক্ষার বিরুদ্ধে শক্তিশালী আন্দোলন গড়ে তোলা একান্ত প্রয়োজন।

রথতলা, পোঃ-চাকদহ, নদীয়া।

কিশোর বিজ্ঞান পরিষদ আয়োজিত

প্রবন্ধ প্রতিযোগিতা

পঞ্চম থেকে দশম শ্রেণী পর্যন্ত ছাত্রছাত্রীদের জন্য কিশোর জ্ঞান-বিজ্ঞান পত্রিকার সহযোগিতায় কিশোর বিজ্ঞান পরিষদ বিজ্ঞানভিত্তিক প্রবন্ধ প্রতিযোগিতার আয়োজন করেছে। প্রতিটি বিভাগে তিনটি করে পুরস্কার ও সার্টিফিকেট অর্পণ করা হবে। সফল প্রতিযোগীদের নাম সেপ্টম্বর '89 সংখ্যায় ঘোষণা করা হবে। রচনা পাঠাবার শেষ তারিখ 31 জুলাই, 1989। লেখার সঙ্গে প্রতিযোগিতার কুপনটি যথাযথ পূরণ করে পাঠাতে হবে। অন্যথায় লেখা বাতিল বলে গণ্য হবে।

প্রবন্ধের বিষয়ঃ

পঞ্চম ও ষষ্ঠ শ্রেণী ঃ তোমার চেনা পাখি
শব্দ সংখ্যা—200

সপ্তম ও অষ্টম শ্রেণী ঃ আমরা ও পরিবেশ
শব্দ সংখ্যা—300

নবম ও দশম শ্রেণী ঃ স্বভাব-বিজ্ঞানী গোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য
শব্দ সংখ্যা—400

পুরস্কৃত রচনাগুলি কিশোর জ্ঞান-বিজ্ঞানের পাতায় প্রকাশিত হবে। রচনা পাঠাতে হবেঃ

সম্পাদকঃ কিশোর বিজ্ঞান পরিষদ
86/1, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলকাতা-700009

প্রতিযোগিতার কুপন

আমি ....
.......বিদ্যালয়ের........শ্রেণীর ছাত্র। বয়স........। ......শ্রেণীর প্রবন্ধ প্রতিযোগিতার জন্য আমার রচনাটি পাঠালাম।

স্বাক্ষর.......

শ্রীমান ....
..................বিদ্যালয়ের..........শ্রেণীর ছাত্র।
প্রধান শিক্ষক মহাশয়ের স্বাক্ষর ....
সীল মোহর..........

ড্রাগ ঃ আধুনিক সভ্যতার অভিশাপ

শান্তনু মিশ্র

ড্রাগ আসক্তি (Drug Addiction) আধুনিক সভ্যতার বুকে এক ভয়ংকর অভিশাপ রূপে নেমে এসেছে। এই আসক্তির মাত্রা এতই তীব্র যে পুনরায় স্বাভাবিক জীবনে ফিরে আসা খুবই কষ্টকর। সরকারের কঠোর নির্দেশ-নীতি সত্ত্বেও পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে দিন দিন এর উৎপাদন বেড়েই চলেছে। এবং এর প্রধান বাজার হিসাবে বেছে নেওয়া হয়েছে তৃতীয় বিশ্বের বিভিন্ন দেশকে যাদের মধ্যে ভারতবর্ষ অন্যতম।

ভারতবর্ষের প্রধান চারটি শহর কলকাতা, দিল্লী, বোম্বাই এবং মাদ্রাজে নেশাগ্রস্ত মানুষের সংখ্যা গুব কম নয়। সাম্প্রতিক কালের পরিসংখ্যায় দেখা গেছে শুধুমাত্র কলকাতা শহরেই মাদকাসক্তের সংখ্যা প্রায় 68000, বর্তমানে কেবল ধনী সম্প্রদায়ই নয় এই নেশায় আসক্ত হচ্ছে মধ্যবিত্ত ও নিম্নবিত্তরাও।

ভারতে ব্যবহৃত উচ্চ মূল্যের ড্রাগ তথা হেরোইন, ব্রাউন সুগার প্রভৃতির একটি ক্ষুদ্র অংশও ভারতে তৈরি হয় না, সবই আসে বিদেশ থেকে। 1984 খ্রীস্টাব্দে ইন্টার-ন্যাশনাল নার্কোটিকস্ বোর্ড ঘোষণা করেছে ভারতবর্ষই মাদক চোরাচালানের প্রধান কেন্দ্র।

কিন্তু ভারতবর্ষকেই ড্রাগ চোরাচালানের প্রধান কেন্দ্র করা হল কেন? তা নিয়ে চিন্তা ভাবনার প্রয়োজন আছে। সাম্রাজ্যবাদী মার্কিন যুক্ত রাষ্ট্র, কলম্বিয়া, বলিভিয়া এবং ল্যাটিন আমেরিকার ড্রাগ উৎপাদনের এক একটি বিশাল কেন্দ্র রয়েছে। সেই সব কেন্দ্র মারফৎ পাকিস্তান, আফগানি-স্তান ইরাণ, নেপাল সীমান্ত হয়ে বড়বড় ব্যবসায়ী চক্রের মাধ্যমে ভারতবর্ষে ড্রাগের প্রবেশ ঘটছে।

বিংশ শতাব্দীর গোড়া থেকে ধনতান্ত্রিক সাম্রাজ্যবাদী অর্থনীতিতে সমস্যা যতই প্রকট হয়ে উঠেছে, ততই সুপরিকল্পিত ভাবে দারিদ্র, অনুন্নত দেশগুলির যুবশক্তিকে আদর্শগত ভাবে মেরুদণ্ডহীন করে দেওয়ার চক্রান্ত শুরু হয়েছে। বর্তমানে আন্তর্জাতিক সাম্রাজ্যবাদ মাদককে ব্যবহার করছে হাতিয়ার হিসাবে। যাতে সর্বদিক থেকে চিরাচরিত শোষণ প্রথাকে বিনা প্রতিবাদে ধরে রাখা যায়। এবং দরিদ্র দেশের সার্বিক নাসকতার ক্ষেত্রে সাম্রাজ্যবাদী মুনাফা খোরদের এ এক ঘৃণ্য চক্রান্ত।

আমাদের দেশে মাদকাসক্তের বিষয়ে কোন পূর্ণ পরি-সংখ্যান নেই। তাহলেও বিভিন্ন সূত্র থেকে জানা যায় অন্ততঃ 25 লক্ষ ভারতবাসী মাদক-এর নেশায় আক্রান্ত, যাদের মধ্যে শতকরা 90% এর বয়স 13 থেকে 28 এর মধ্যে। প্রতিদিন গড়ে প্রায় 308 জন ভারতবাসী এই নেশার ফাঁদে পা দিচ্ছে। মারা যাচ্ছে গড়ে প্রায় 6 জন করে।

মাদক ব্যবসায়ে মুনাফা আকাশ ছোঁওয়া, high times (U.S.A.)-এর একটি পরিসংখ্যানে জানা যায় যে 1kg হেরোইনের ভারতে দাম 80,000 টাকা সেখানে পাকিস্তানে দাম তার 40,000 টাকা।

দরিদ্র দেশ এই ভারতবর্ষ যেখানে অসংখ্য মানুষ পেট ভরে খেতে পায় না, প্রতি হাজার জন শিশু জন্মের পরেই মারা যায়, শুধুমাত্র পরিশ্রুত জলের অভাবে লক্ষ লক্ষ মানুষের জীবন শেষ হয়ে যায়, কোটি কোটি কর্মক্ষম হাত বেকারত্বের জ্বালায় নিষ্ক্রিয় হয়ে থাকে—সেই অবক্ষয়-এর সুসজ্জিত পথ ধরে সমাজ জীবনে প্রবেশ করে মাদক। শহরে গ্রামে বস্তিতে সর্বত্রই এর সমান প্রভাব।

মাদক-এর এই ভয়ঙ্কর আগ্রাসনের বিরুদ্ধে প্রত্যেক মানুষকেই এগিয়ে আসতে হবে। কেউ যদি এই নেশায় আক্রান্ত হয়ে পড়ে তাহলে তাকে সুস্থ জীবনে ফিরিয়ে দেওয়ার দায়িত্ব আমাদেরই। এবং সেই সঙ্গে আমাদের অভিযান সেই সব অর্থ লোভী মাদক ব্যবসায়ীদের বিরুদ্ধে চলছে এবং চলবে।

তারকেশ্বর উচ্চ বিদ্যালয় হুগলী

প্রকৃতি পড়ুয়া রবীন্দ্রনাথ

প্রিয়ব্রত মুখোপাধ্যায়

সাধারণ মানুষের জীবনের শরীক হতে পারেন নি বলে রবীন্দ্রনাথের মনে খেদ থাকলেও প্রকৃতির সঙ্গে যে তাঁর অন্তরের নিবিড় যোগ ছিল তাতে কোন সন্দেহ নেই। হতশ্রী কলকাতাকে তিনি কোনদিন ভালবাসতে পারেন নি। তাই একবার বলেছিলেন সুন্দরের পূজারী রবীন্দ্রনাথ—'পৃথিবী কি আশ্চর্য সুন্দরী তা কলকাতায় থাকলে ভুলে যেতে হয়।' তাঁর কথাসাহিত্যে, কাব্যে বারবার ছায়া ফেলেছে বাংলার পল্লী প্রকৃতি। যৌবনে যখন তাঁর ওপর ভার পড়ে জমিদারী দেখাশোনার তখন তিনি ঘরের আরাম ছেড়ে বেছে নিয়েছিলেন পদ্মানদীর ওপর হাউসবোট, যাতে প্রকৃতিকে চিনতে পারেন পারেন। তার রহস্য উন্মোচন করতে বাংলার প্রকৃতির ছবি ফুটে উঠেছে ছিন্নপত্রের প্রতিটি পত্রে। রবীন্দ্রনাথ প্রকৃতির বন্দনা করেছেন নানা কবিতায় অজস্র গানে। বৃক্ষবন্দনা নামে কবিতা লিখেছেন। বনবাণী গ্রন্থে বহু তরুলতা ও ফুল নিয়ে কাব্য রচনা করেছেন। কত গাছের নতুন নতুন নামকরণ করেছেন। নীলমণিলতা, সোনাঝুরি, হিমঝুরি, বনপুলক এমন সব অসাধারণ নাম তাদের। নীলমণিলতার ইংরেজি নাম পেট্রিয়া। লতাটি ছিল রবীন্দ্রনাথের অত্যন্ত প্রিয়। নীলমণিলতা নামে একটি সুন্দর কবিতা আছে তাঁর—সুদূর ভরতপুরে বসে এটি লিখেছিলেন তিনি। তাঁর নিজের বাগানের এই গাছটিতে নিজের হাতে জল দিতেন। ফুল ফুটলে খুশি হয়ে সবাইকে ডেকে দেখাতেন।

ছোটবেলা থেকেই ছেলে-মেয়েদের বাগান করতে শেখানোর ব্যাপারে উৎসাহ দিতে চাইতেন রবীন্দ্রনাথ। তিনি বলতেন যাদের বাড়িতে জমি নেই তারা যেন টবে গাছ লাগায়। তাঁর মতে, 'এতে করে শিশুদের মন সজাগ হয়ে ওঠে। প্রকৃতির মধ্যে কতো বৈচিত্র্য তা অনুভব করে আনন্দ পাবে।'

পরিবেশকে সুন্দর করে তোলে বৃক্ষ। তাই চারদিকে আজকাল বৃক্ষরোপন অনুষ্ঠান হতে দেখা যায় মহা সমারোহে। আমাদের দেশে এ-ব্যাপারে পথিকৃতের মর্যাদা যাঁর প্রাপ্য তিনি কোন বিজ্ঞানী নন, সাধারণ্যে তাঁর পরিচিতি কবি

রবীন্দ্রনাথ প্রকৃতির বন্দনা করেছেন নানা কবিতায়, গানে.....

হিসাবে—তিনি বিজ্ঞানমনস্ক রবীন্দ্রনাথ। কবি 1928 সালের 14ই জুলাই শান্তিনিকেতনে বেশ ঘটা করে বৃক্ষ-রোপন করেছিলেন। শান্তিনিকেতনের বনহীন রুক্ষ মরুপ্রায় প্রকৃতি দেখে কবি এই সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। পরদিন 15ই জুলাই শ্রীনিকেতনে হয়েছিল হলকর্ষণ বা সীতাযজ্ঞ। কবি সেদিন নিজেই হলচালনা করেছিলেন। বর্ষামঙ্গল উৎসবও তাঁরই সৃষ্টি। এই প্রসঙ্গে তাঁর সচেতনতার আর একটি পরিচয় দিলে বোধ হয় বাহুল্য হবে না। তাঁর এক-মাত্র পুত্র রথীন্দ্রনাথকে তিনি আমেরিকা পাঠিয়েছিলেন ডাক্তারি বা ইঞ্জিনিয়ারিং পড়তে নয়—কৃষিবিদ্যা শেখার জন্যে।

কবি পশুপাখি ভালবাসতেন। রোজ সকালে ঘুম থেকে উঠে পাখিদের জন্যে মুড়ি ছোলা ছিটিয়ে দিতেন। রাজ্যের শালিখ পায়রা চড়াই পাখি সেগুলো খুঁটে খুঁটে খেত। পাখিদের খাওয়া দেখে তাঁর মন আনন্দে ভরে উঠত। খাঁচায় পাখি বা বাড়িতে জন্তু পোষার বিরোধী ছিলেন তিনি। আর বিরোধী ছিলেন শিকারের। তাই দেখি যৌবনে জমিদার রবীন্দ্রনাথ তাঁর জমিদারীতে প্রথম যে নোটিশ জারী করেছিলেন সেটি ছিল পাখি মারার বিরুদ্ধে নিষেধ করে। তাঁর জমিদারীতে কোন শিকারী এমন কি কোন রাজকর্মচারীও পাখি মারতে পারত না। এই প্রসঙ্গে শিলাইদহের সেই ঘটনাটি মনে পড়ে। সেই সময় এক জোড়া চখাচখির কলকাকলিতে শিলাইদহের আকাশ বাতাস ভরে উঠেছিল। এদিকে হল কি কবিপুত্র কিশোর রথীন্দ্রনাথের মনোরঞ্জনের জন্যে তার সঙ্গী জনৈক মাঝির গুলির আঘাতে সেই চখাচখির একটি প্রাণ হারায়। সাথীহারা অপর পাখিটির আর্ত বিলাপ শুনে রবীন্দ্রনাথ বিষণ্ণ হয়ে পড়েন আদি কবি বাল্মীকির মত। আর তখনই এই নিষেধাজ্ঞা জারী হয়েছিল। আর একটি ঘটনার কথা বলি। 1927 সালে ভরতপুরের মহারাজার আমন্ত্রণে কবি সেখানে গেলে তাঁকে নিয়ে যাওয়া হল বিখ্যাত পক্ষিনিবাসে। সেখানকার সুন্দর প্রাকৃতিক পরিবেশে অসংখ্য পাখির কলগুঞ্জনে কবি যখন মুগ্ধ হয়ে পড়েছেন তখন হঠাৎ তাঁর চোখে পড়ল একটি ফলক যাতে লেখা রয়েছে কোন্ শিকারী কবে ক'হাজার পাখি শিকার করেছে তার এক বিরাট তালিকা। সেটি দেখা মাত্র মর্মাহত কবি সেই স্থান ত্যাগ করেছিলেন।

তাঁর প্রকৃতি প্রেমের আর সেই সঙ্গে বিজ্ঞান সচেতনতার আর একটি দৃষ্টান্ত দিই। এক সময় শান্তিনিকেতনে সাপের ভীষণ উপদ্রব হয়েছিল। আশ্রমিকরা সর্পভয়ে ভীত হয়ে সাপ মারতে শুরু করলে গুরুদেব রবীন্দ্রনাথ আশ্রমে সাপ মারতে নিষেধ করেছিলেন। খাদ্য শৃঙ্খলে সাপের বিশিষ্ট ভূমিকার কথা তোমরা যারা জীবন বিজ্ঞান পড়েছ তাদের নিশ্চয়ই নতুন করে বোঝাতে হবে না।

21/12 নিউটন এভিন্যু, দুর্গাপুর-713,205

বিদ্যুৎ চুরির বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তুলুন

বিদ্যুৎ সংযোগের জন্য অপেক্ষমান হাজার হাজার আবেদনকারীকে বঞ্চিত করে এক শ্রেণীয় লোক অবৈধভাবে বিদ্যুৎ চুরি করে চলেছে হুকিং ও ট্যাপিং করে। ফলে গ্রাহকের ঘরে জ্বলছে না আলো। প্রয়োজনের অতিরিক্ত চাপ সহ্য করতে না পেরে জ্বলে যাচ্ছে ট্রান্সফরমার। সংশ্লিষ্ট অঞ্চলে নেমে আসছে অন্ধকার। পশ্চিমবঙ্গে যখন বিদ্যুৎ উৎপাদন ও সরবরাহ ব্যবস্থার প্রভূত উন্নতি ঘটছে তখন সুষ্ঠু বিদ্যুৎ ব্যবস্থাকে বানচাল করে দিতে এক শ্রেণীর সমাজ বিরোধী সক্রিয়। বিদ্যুৎ চুরির মোকাবিলা করুন, বিদ্যুৎ চোরের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তুলুন।

বিদ্যুৎ চুরির সাজা এখন আরো কঠিন এবং জামিনের অযোগ্য।

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য বিদ্যুৎ পর্ষদ
পশ্চিমবাংলার জীবনের অংশীদার

'মডেল' এর রকমফের

নির্মলেন্দু বিকাশ পাত্র

অলটারনেট অ্যাকশন সুইচ

নামটা থেকেই আন্দাজ করা যাচ্ছে যে একটা pushto-on-switch-এর সাহায্যেই এখানে on/off কাজটা করা হবে। এই ধরনের সুইচ সাধারণত electronic equipment চালাতে ব্যবহৃত হয় কারণ, এতে false

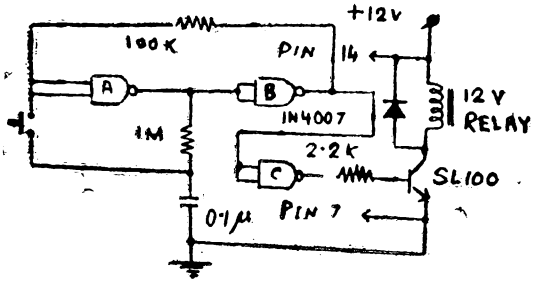

switching-এর সুযোগ কম। এখন সুইচটা কিভাবে কাজ করে দেখা যাক।

Circuit-এ দুটো NAND Gate-কে inverter-এর মতো ব্যবহার করা হয়েছে। দুটো Gate-এর এমন ভাবে সংযোগ করা হয়েছে যার ফলে একটা Latch circuit তৈরি হয়েছে যার input-এ '0' বা '1' কোন pulse দিলে ওটা সেই state-এ থেকে যায়। এই ব্যাপারটা করা সম্ভব হচ্ছে feedback resistor-এর সাহায্যে। input pulseটা যখন output থেকে পাওয়া যাচ্ছে তখন এই feedback resistor-এর সাহায্যে input-এ আবার একই pulse আসছে, সুইচ থেকে হাত তুলে নেবার পরেও। ধরা যাক একেবারে সার্কিটে power দেবার সময় প্রথমে সুইচের সাহায্যে আমরা 1st inverter-এ '0' pulse দিলাম, সেক্ষেত্রে এটা '0'-কে '1'-এ পরিবর্তিত করবে এবং 2nd gate '1'-কে '0'-তে পরিবর্তিত করবে। এখন সার্কিটের Capacitorটি '1'-এ Charged হয়ে থাকবে, ফলে পরবর্তী বার switch press করলে input-এ '1' আসবে এবং outputও পরিবর্তিত হয়ে যাবে, এইভাবে ক্রমান্বয়ে সুইচ টিপে Circuit-কে কাজ করানো যেতে পারে।

এখানে আমরা দুটো Gate ব্যবহার করে একটা Circuit করেছি। কাজেই আরো বাড়তি দুটো Gate আরো একটা একই Circuit তোমরা করতে পারো। ফলে একটা IC ব্যবহার করে দুটো এই ধরনের switch করা যাবে।

চামরাইল, হাওড়া-711323

মহাবিশ্বের কথা

সূর্যেন্দুবিকাশ করমহাপাত্র

এই বইতে মহাবিশ্বকে জানতে আদিযুগ থেকে জ্যোতির্বিজ্ঞানের যে ক্রমবিকাশ ঘটেছে তার ধারাবাহিক বিবরণ আছে। মহাবিশ্বের উৎপত্তি, স্থিতি ও বিলয়ের পটভূমিকায় মহাজগৎতত্ত্বের আধুনিকতম ধারণাও আলোচিত হয়েছে। Cosmology বা মহাজগৎতত্ত্বে মৌলিককণা ও ক্যুআর্কের উল্লেখযোগ্য ভূমিকা এযুগের এক বিস্ময়কর আবিষ্কার। মৌলিককণা ও ক্যুআর্ক তত্ত্ব, ক্রোমোডিনামিক্স প্রভৃতি আলোচনা করে লেখক সেই ভূমিকার গুরুত্ব বাংলাভাষী পাঠকের কাছে তুলে ধরেছেন। মূল্য : ২০ টাকা

প্রকাশক
সাহিত্যবিহার
১বি, মহেন্দ্র শ্রীমাণী স্ট্রীট, কলিকাতা-৭০০ ০০৯

পরিবেশক
ওরিয়েন্টাল বুক কোম্পানী প্রাঃ লিঃ
৫৬, সূর্য সেন স্ট্রীট, কলিকাতা-৭০০ ০০৯

গোপালচন্দ্র : একটি মূল্যায়ন

শকুন্তলা ভট্টাচার্য

জ্ঞানের তৃষ্ণা মানুষের মধ্যে চিরন্তন আর এই তৃষ্ণার মূল কথা মানুষের পারিপার্শ্বিকের সম্বন্ধে সচেতনতা। অসম্পূর্ণ শিক্ষা ও প্রতিকূল পরিস্থিতি অনেক সময় মানুষকে পারিপার্শ্বিক সম্বন্ধে উদাসীন হতে বাধ্য করে, তার অনুসন্ধিৎসাকে ধ্বংস করে, কিন্তু এই প্রতিকূলতার মধ্যেও কিছু মানুষ মনের মধ্যে প্রকৃতির রহস্যের আবরণ ভেদ করার এক শৈশব আগ্রহ সযত্নে লালন করে থাকে।

গোপালচন্দ্র ছিলেন এই রকম এক মানুষ। অবিভক্ত বাংলার এক সুদূর গ্রামে (ফরিদপুর জেলার লোনসিং গ্রামে 1895 খ্রীঃ 1লা আগস্ট) তিনি জন্ম গ্রহণ করেন এবং বলতে গেলে প্রকৃতির কোলেই বেড়ে ওঠেন। তীক্ষ্ণ নিরীক্ষণ ক্ষমতা, যা বিজ্ঞানীর চরিত্রের অবিচ্ছেদ্য অংশ, তা গোপালচন্দ্রের চরিত্রের অন্যতম বৈশিষ্ট ছিল। তাঁর লেখা বিভিন্ন প্রবন্ধাদি থেকে বোঝা যায় যে প্রকৃতি তার সৌন্দর্য ও রহস্যে পরিবৃত হয়ে তাঁকে চিরদিন হাতছানি দিয়ে যেন ডেকেছে। কিন্তু তাঁর দৃষ্টিভঙ্গীতে এক আশ্চর্য বিজ্ঞানী-সুলভ নৈর্ব্যক্তিকতা ছিল। যার ফলে তিনি শুধু মুগ্ধ হয়েই থেমে যাননি ; তিনি যৌক্তিকতার সংগে এই রহস্য ভেদ করতে চেয়েছিলেন। গোটা ব্যাপারটি খুব মনোযোগ ও সময় সাপেক্ষ। অথচ গোপালচন্দ্র ছিলেন এক অভাবী পরিবারের জ্যেষ্ঠ পুত্র, যার বাবা অকালে মৃত্যু মুখে পতিত হয়েছেন। তাই যথেষ্ট কৃতিত্বের সংগে ম্যাট্রিকুলেশন উত্তীর্ণ হলেও, ইন্টারমিডিয়েট পড়া তাঁর সম্পূর্ণ হল না। পরিবর্তে তাঁকে তাঁর গ্রামের বিদ্যালয়ে শিক্ষক হিসেবে যোগ দিতে হল। খুবই কম বয়সে গোপালচন্দ্রকে তাঁর বিধবা মা ও তিন কনিষ্ঠ ভ্রাতার সংসারের একমাত্র উপার্জক হয়ে হাল ধরতে হল।

এটা তাঁর পক্ষে যতই মর্মান্তিক হোক না কেন, এতে তিনি ভেঙে পড়লেন না। তিনি অত্যন্ত যত্ন সহকারে তাঁর ছাত্রদের পড়াতে লাগলেন তার চেয়েও বড় কথা, তিনি তাদের মধ্যে ভৌগলিক ও সামাজিক পারিপার্শ্বিক সম্বন্ধে একটা আগ্রহ জাগাতে সক্ষম হলেন। তিনি তাঁর ছাত্রদের সঙ্গে গাছ পালা, পশুপাখি, কীটপতঙ্গ লক্ষ করতে লাগলেন ও এগুলি সম্বধে নানা তথ্য সংগ্রহ করতে লাগলেন। আবার অন্যদিকে তারা বিভিন্ন লোকগাথা ও লোকসংগীত চর্চা করে সেই চিরাচরিত মৌখিক লোক সাহিত্যগুলিকে সুসমঞ্জস লিখিত রূপ দেবার চেষ্টা করতে লাগলেন। এক সময় তিনি তাদের একটি হাতের লেখা পত্রিকা প্রকাশ করার ব্যাপারে নেতৃত্ব দিলেন। কিন্তু এই সময়ে তাঁর সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য কাজ হল সাধারণ মানুষের মন থেকে বহু "আপাত আলৌকিক" ঘটনা সম্বন্ধে সবরকম ভ্রান্তি ও কু-সংস্কার দূর করার চেষ্টা। এই ভাবে কত ভূত বা পোত্নীর অস্তিত্বের পেছনে দেখা গেল হয় মানুষেরই কোন চাতুরী, নয়ত আলেয়ার মত প্রাকৃতিক কোন ঘটনা ! রয়েছে ,

১৯১৯ সালের কাছাকাছি গোপালচন্দ্র তৎকালীন বিখ্যাত বাংলা পত্রিকা প্রবাসীতে ছোট ছোট তিনটি প্রবন্ধ পাঠিয়েছিলেন ; তিনটিরই বিষয়বস্তু ছিল পাছপ্যালার আলোক বিকিরণ ক্ষমতার উপর। এগুলি প্রকাশিত হওয়া মাত্র আচার্য জগদীশ চন্দ্র বসুর দৃষ্টি আকর্ষণ করল। ইতি মধ্যে তাঁকে বিশেষ কাজে কলকাতা যেতে হয়েছিল এবং গিয়েই বেঙ্গল চেম্বার অফ কমার্সে টেলিফোন অপারেটরের কাজ পেয়ে সেখানে থেকে গিয়েছিলেন। কাজটি যে তাঁর মনের মত হয়েছিল তা বলা যায় না, কিন্তু এতে তাঁর কলকাতায় থেকে বৃহত্তর পরিধির লোকের সঙ্গে মিশবার সুযোগ মিলেছিল, তাতে সন্দেহ নেই। সর্বোপরি, এই কাজেই তাঁকে একদিন আচার্য জগদীশ বসুর কাছে যাবার সুযোগ করে দিয়েছিল। তাঁর এক পরিচিত ব্যক্তি, যাঁকে আচার্য বসুও জানতেন, তিনি একদিন এসে খবর দিলেন যে গোপালচন্দ্রের ডাক এসেছে বিজ্ঞানাচার্যের কাছ থেকে। আচার্য বসু সব বৃত্তান্ত শুনে তাঁকে তৎক্ষণাৎ সহকারী গবেষক হিসেবে বসু বিজ্ঞান মন্দিরে যোগদান করতে অনুরোধ করেন। গোপালচন্দ্র বিনা দ্বিধায় পূর্বতন চাকরী ছেড়ে বিজ্ঞান মন্দিরে প্রবেশ করলেন। আচার্য বসু তাঁকে গাছ-পালার আলোক বিকিরণ ক্ষমতার ওপর আরও কাজ করতে উৎসাহ দিলেন। এই সুযোগটির জন্যেই যেন তিনি এতদিন অপেক্ষা করছিলেন। তিনি মন প্রাণ দিয়ে গবেষণার কাজে ডুবে রইলেন। ইতি মধ্যে তিনি গভর্ণমেন্ট আর্ট স্কুলে ছবি আঁকা ও ফোটোগ্রাফার স্কুলে ফোটোগ্রাফির খুটিনাটি শিখে ফেলেছেন। পরবর্তী জীবনে বসু বিজ্ঞান মন্দির থেকে যে সব গবেষণা পত্র প্রকাশ করা হত, সেগুলি ছবি ও ফোটোসহ সজ্জিত করতে এই সব বিদ্যা তাঁর খুবই

কাজে লেগেছিল। ইলেকট্রনিক যন্ত্রপাতি ব্যবহার করতে করতে সেগুলি সম্বন্ধে তাঁর যথেষ্ট জ্ঞান জন্মায়। তা দেখে আচার্য বসু এ ব্যাপারে তাঁর ট্রেনিং-এর ব্যবস্থা করেন ক্লাইড এঞ্জিনিয়ারিং কলেজে। অণুবীক্ষণ যন্ত্র নিয়ে কাজ করতে করতে তাঁর 'অণুজীব বিদ্যা' (microbiology) সম্বন্ধে আগ্রহ জন্মায়। আচার্যের উৎসাহে একটি গবেষণা পত্রও লেখেন এ বিষয়ে। কিন্তু দুর্ভাগ্য বশতঃ এই গবেষণাপত্র আচার্য বসুর অনুমোদন পায়নি। এবার তিনি এমন একটি বিষয় নিয়ে গবেষণা আরম্ভ করেন যা তাঁর চিরকালের আগ্রহের বস্তু ছিল। তিনি কীটপতঙ্গ নিয়ে কাজ শুরু করেন। শৈশব থেকেই তিনি গ্রাম বাংলার নানা কীট-পতঙ্গের গতিবিধি লক্ষ করে আসছেন ও এ সব নিয়ে ভাবনা চিন্তা করে আসছেন। এখন তো তাঁর হাতে এসে গেছে খুব সুবিধা জনক এক হাতিয়ার —একটি ক্যামেরা। তাই তিনি খুব অদ্ভুত একটি ছবি তুললেন, এক বিশাল মাকড়শা একটি ছোট মাছকে শিকার করছে। আচার্য-এ ছবি দেখে মুগ্ধ না হয়ে পারলেন না। আচার্য তাঁকে পরামর্শ দিলেন মাকড়সার জীবন ভালভাবে লক্ষ করতে ও পরে এর ওপর একটি গবেষণা পত্র লিখতে। এই পরিশ্রম ছিল গোপালচন্দ্রের পক্ষে পরম সুখকর। তিনি অচিরেই গবেষণা পত্রটি শেষ করলেন! এটি একজন বিখ্যাত বিজ্ঞানীর কাছে পাঠানো হয় এবং তিনি এই কাজের খুব প্রশংসা করলেন। আচার্য বসু এই কাজটির একটি অংশ বসু বিজ্ঞান মন্দিরের 'ট্রান-জাক্‌শন'-এ প্রকাশ করলেন। গোপাল চন্দ্র যে এতে কত আনন্দিত হলেন তা বলে বোঝান যায় না। উৎসাহের উন্মাদনায় তিনি এবার শহরতলীর ঝোঁপঝাড় বন-জঙ্গল ঘুরে ঘুরে আশ্চর্য সব পোকামাকড় লক্ষ করে বেড়াতে লাগলেন। তাঁর হাতে থাকত তাঁর ক্যামেরা, যাতে দরকার হলেই ছবি তোলা যায়। অনেক সময় অজ্ঞ গ্রামবাসীরা তাঁকে সন্দেহের বশে অপমান করেছে, এমন কি গায়েও হাত তুলেছে। তাদের সীমিত বুদ্ধিতে তারা এই ঝোপে-ঝাড়ে অপেক্ষমান ব্যক্তিটিকে নিশ্চয়ই চোর নয়ত অন্য কুমতলববাজ ভেবে থাকবে।

এই নিরীক্ষণের ফল স্বরূপ তিনি পোকামাকড়ের জীবনের উপর প্রথম শ্রেণীর বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ লেখার যথেষ্ট মাল-মসলা পেয়েছিলেন। এই প্রবন্ধগুলি প্রায় তিন দশক ধরে বিভিন্ন উৎকৃষ্ট পত্রিকায় ছাপা হয়েছিল (চল্লিশের দশক থেকে ষাটের দশক পর্যন্ত)।

বাংলা ভাষায় বিজ্ঞান চর্চায় তাঁর লেখার অবদান যথেষ্ট। যখন তিনি গ্রামে শিক্ষকতা করেছেন তখন থেকেই তিনি **প্রবাসী**-তে লিখে আসছেন। বসু বিজ্ঞান মন্দিরে গবেষণা কাজের ফাঁকে ফাঁকে তিনি বিভিন্ন বাংলা পত্র পত্রিকায় সহজ ভাষায় বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ লিখেছেন। এই পত্রিকাগুলির মধ্যে **বঙ্গশ্রী, উদয়ন, কাজের লোক, অলোকা, প্রকৃতি, নবারুণ, দেশ, যুগান্তর আনন্দবাজার পত্রিকা, সন্দেশ, শিশুসাথী** এবং **জ্ঞান ও বিজ্ঞান** অন্যতম। শেষ উল্লিখিত পত্রিকাটি গোপালচন্দ্রের পালিত পুত্রের মত ছিল। এর জন্ম থেকে পুরোপুরি স্বনির্ভর হওয়া পর্যন্ত গোপালচন্দ্রই এর তত্ত্বাবধান করেছিলেন।

1948 সালে আচার্য সত্যেন্দ্রনাথ বসু বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ প্রতিষ্ঠা করেন এবং বাংলা ভাষায় বিজ্ঞান শিক্ষার দাবী তোলেন। এই সংস্থার মুখপত্র **জ্ঞান ও বিজ্ঞান**-এর সম্পাদনার দায়িত্ব তিনি গোপালচন্দ্রের হাতে অর্পণ করেন। গোপালচন্দ্র অত্যন্ত দায়িত্বের সঙ্গে 1976 সাল পর্যন্ত এটি সম্পাদনা করে এসেছেন। 1976 সালের পরেও তিনি এর প্রধান উপদেষ্টা পদে আসীন ছিলেন তাঁর মৃত্যু পর্যন্ত। সম্পাদনা করার সময় তিনি এতে স্বনামে বাইরের প্রবন্ধ না পেলে ছদ্মনামেও লিখেছেন। তিনি সর্বদা সচেষ্ট ছিলেন যাতে তাঁর পত্রিকা পাঠকদের কাছে যথাযথ সময়ে পৌঁছায়।

তাঁর লেখা অন্যান্য বিজ্ঞান পুস্তকগুলি বাংলায় বিজ্ঞান চর্চার ক্ষেত্রে বিশিষ্ট সংযোজন। এই পুস্তকগুলির মধ্যে প্রধান হল—**আধুনিক আবিষ্কার, বাংলার মাকড়শা, করে দেখ (তিন খণ্ডে), বাংলার কীটপতঙ্গ, আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু, মহাশূন্যে অভিযান, আণবিক বোমা, পশু-পাখী-কীট-পতঙ্গ, বাংলার গাছপালা, বিজ্ঞানের আকস্মিক আবিষ্কার,** এবং **বিজ্ঞান অমনিবাস**।

৮ম বার্ষিক স্মরণ সভায় ডঃ জয়ন্ত বসু ভাষণ দিচ্ছেন। পাশে উপবিষ্ঠ তুষারকান্তি দত্ত, নারায়ণ চৌধুরী ও ডঃ সুকুমার গুপ্ত।
ফটো : সুভঙ্কর মুখোপাধ্যায়

মাতৃভাষার প্রতি তাঁর অকুণ্ঠ সেবাকে সম্মান জানাতে তাঁকে 1968 সালে "আনন্দ পুরস্কার", 1974 সালে "আচার্য সত্যেন্দ্রনাথ বসু স্মৃতি ফলক ও 1975 সালে রবীন্দ্র পুরস্কার প্রদান করা হয়। তাঁর কাজের স্বীকৃতি হিসেবে

1980 সালে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে সম্মানিক ডক্টরেট অফ সায়েন্স ডিগ্রীতে ভূষিত করে। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের আমন্ত্রণে তিনি **ভারত কোষ** (চার খণ্ড) সম্পাদনার দায়িত্ব গ্রহণ করেন এবং সম্পাদক মণ্ডলীর অন্যতম সদস্য হন। পশ্চিমবঙ্গ সরকার তাঁকে 'পরিভাষা কমিটির' সদস্য নির্বাচিত করে।

কিন্তু তাঁর প্রতিভার পরিমাপ কিছু জাগতিক সম্মান ও পুরস্কারে নয়। কারণ তিনি এমন এক মানুষ ছিলেন যাঁর কাছে কাজের প্রতি নিষ্ঠা ছিল প্রথম এবং শেষ কথা। জাগতিক প্রাপ্তি তাঁকে তাঁর ভালবাসার বস্তু প্রকৃতি থেকে প্রলুব্ধ করে এক কণাও নড়াতে পারত না। তিনি তাঁর বিজ্ঞান চর্চার বিনিময়ে তো নিজের কোন জাগতিক উন্নতি চান নি। তা চাইলে তিনি পেতে পারতেন সহজেই।

এই প্রকৃতির রহস্য ভেদ কামী অবিচল তপস্বী ছিলেন, চেহারা ও বেশভূষায় অতি সাদামাটা, মৃদু ভাষী, শান্ত মেজাজের এবং রসিক স্বভাবের। তাঁর জীবন থেকে আমরা এটাই উপলব্ধি করতে সক্ষম হয়েছি যে বিজ্ঞান চর্চা করতে গেলে স্যুট-বুট, ইংরেজীর ফুলঝুরি অথবা উচ্চ পদমর্যাদা —এসব কোন কিছুরই দরকার হয় না। অথচ একজন বিদ্বান বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বোচ্চ বিজ্ঞান-ডিগ্রী ধারী ব্যক্তি গ্রহরত্ন অঙ্গুলিতে ধারণ করেছেন, অথবা মন্ত্রপূত কবচ, তাবিজ পরেছেন, অথবা জ্যোতিষী বা ওঝার কাছে পরামর্শের জন্য গেছেন—শুধুমাত্র অজানা অশুভ শক্তির হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্যে, এ দৃশ্য তো এখনো আমাদের দেশে খুব বিরল নয়। এ দৃশ্য গোপাল চন্দ্রের ধৈর্যের বাঁধ ভেঙে তাঁকে নিশ্চয় ক্রুদ্ধ করতো। এই সহজ মানুষটি যুক্তিনিষ্ঠ জীবন-যাপন করেছেন। কখনো তথাকথিত অলৌকিক ক্ষমতার সাহায্য নেবার চেষ্টা করেন নি। কখনো এমন কোন কাজ করেন নি যাতে তাঁর বিজ্ঞান-মানসের সমর্থন ছিল না। তাঁর জীবনের প্রধান লক্ষ বলা যায় জীবনকে যুক্তিনিষ্ঠ ভাবে গ্রহণ করার এক সাধনাকে। তিনি এটা অনুসন্ধান করেছিলেন যে যুক্তিনিষ্ঠা মানুষের মধ্যে সহজেই জন্মায় যদি সে মাতৃভাষার মাধ্যমে বিজ্ঞান শিক্ষা করে। তাই বিজ্ঞান চর্চা ও মাতৃভাষার প্রতি অনুরাগ এই দুই লক্ষ চন্দ্র সূর্যের মত দুটি উজ্জ্বল অনুপ্রেরণা হয়ে সারা জীবন তাঁকে চালিত করে।

আমাদের দেশে বিজ্ঞান শিক্ষা যদি দেশের লোকের মধ্যে বিজ্ঞান মানসিকতা সৃষ্টিকে যথেষ্ট গুরুত্ব দেয়, তবে সেদিন আমরা গোপাল চন্দ্রের অবদান সম্যক রূপে অনুভব করব। যদি কোনদিন আমাদের মাতৃভাষাকে যথাযথ সম্মানের সঙ্গে বিজ্ঞান চর্চায় ব্যবহার করা হয়, যেমন অন্যান্য সভ্য দেশে করা হয়ে থাকে, তবে সেদিন আমরা গোপাল চন্দ্রকে আমাদের দিশারী হিসেবে স্মরণ করব।

গোপালচন্দ্রের সংক্ষিপ্ত জীবনপঞ্জী

জন্ম ঃ 1লা আগস্ট, 1895, পিতা ঃ অম্বিকাচরণ, মাতা ঃ শশীমুখী,, ভ্রাতা ঃ নেপালচন্দ্র, পঙ্কজবিহারী, বঙ্কিম বিহারী

শিক্ষা ঃ 1913 সালে ম্যাট্রিকুলেশন পাস করেন। ইণ্টার মিডিয়েট (সাহিত্য) শ্রেণীতে ভর্ত্তি হন, ময়মন-সিংহের আনন্দমোহন কলেজে। কিন্তু 1915 সালে শিক্ষা অসম্পূর্ণ রেখে চাকরি নেন।

বৈবাহিক জীবন ঃ ফরিদপুরের শ্রীনাথ ও হেমপ্রভা চক্রবর্তীর কন্যা লাবণ্যপ্রভাকে বিবাহ করেন 1914 সালে। চার পুত্র—সুধীর, বিনয়, নীহার ও মিহির, এবং এক কন্যা রাণী।

চাকুরী জীবন ঃ 1915-1919 লোনসিং হাইস্কুলের শিক্ষক হিসেবে কাজ করেন। 1919-21 বেঙ্গল চেম্বার অফ কমার্স-এ টেলিফোন অপারেটর হিসেবে কাজ করেন। 1921-71 বসু বিজ্ঞান মন্দিরে প্রথমে আচার্য বসুর সহকারী হিসেবে ও পরে স্বাধীন গবেষক হিসেবে নিযুক্ত থাকেন।

গবেষণা ঃ 1930 সালে মাছ খেকো মাকড়সার উপর মৌলিক গবেষণাটি বসু বিজ্ঞান মন্দিরে ট্রানজাকসনে (1931-32) প্রকাশ হয়। 1934-35 নতুন ধরণের মাকড়শার ওপর কাজ করেন। চারটি প্রবন্ধ বোম্বাই-এর ন্যাচারাল হিস্ট্রি, সোসাইটি, সায়েন্টিফিক মান্থলি (আমেরিকা) সায়েন্স এণ্ড ক্যালচার (কলিকাতা)-তে প্রকাশিত হয়। 1936-43—14টি গবেষণা পত্র দেশী ও বিদেশী পত্রিকায় প্রকাশিত হয়।

জ্ঞান বিজ্ঞানে প্রথমে সম্পাদক, পরে প্রধান সম্পাদক (1950-76) ও শেষে প্রধান উপদেষ্টা হিসাবে নিযুক্ত ছিলেন (1976-80)। বাংলা এনসাইক্লোপিডিয়া ভারত কোষের সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য ছিলেন। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পরি-ভাষা কমিটির সদস্য ছিলেন।

স্বীকৃতি ঃ 1951 সালে প্যারিসে অনুষ্ঠিত সামাজিক পোকা-মাকড়ের উপর সেমিনারে ভারতের প্রতিনিধিত্ব করার আমন্ত্রণ পান। 1968 সালে আনন্দ পুরস্কার পান। 1974 সালে বসু বিজ্ঞান মন্দিরে নাগরিক সম্বর্ধনা ও আচার্য সত্যেন্দ্রনাথ বসু স্মৃতি ফলক লাভ করেন। 1975 সালে রবীন্দ্র পুরস্কার পান। 1979 সালে বসু বিজ্ঞান মন্দির হীরক জয়ন্তী অনুষ্ঠানে জুবিলি মেডেল লাভ করেন। 1980 সালে কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয় প্রদত্ত সম্মানিক ডক্টরেট অফ সায়েন্স ডিগ্রী লাভ করেন।

মৃত্যু ঃ 1981 সালের 18ই এপ্রিল তিনি পরলোক গমন করেন।

কুইজ কনটেস্ট

গ্রেড I

জুন '৪9 VII-VIII

1. 'অরোভিল' কোথায় অবস্থিত ?
2. 'অ্যাটিলা' কে ছিলেন ?
3. ... মুসলমান কোরান মুখস্থ করে ফেলেছেন তাঁকে কি বলা হয় ?
4. কোন দেশে পিয়ানো আবিষ্কৃত হয় ?
5. বিখ্যাত ভারতীয় গায়ক কে. এল. সায়গলের পুরো নাম কি ?
6. ইনি আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের এক

বিখ্যাত ব্যক্তি। ইনি কে ?

7. টি. এন. টি. কি রকম পদার্থ?
8. শনির সর্ববৃহৎ উপগ্রহটির নাম কি ?
9. মাকড়সার ক'টি অঙ্গপ্রত্যঙ্গ আছে ?
10. ভাগবত গীতা কার লেখা ?

গ্রেড II

জুন '89 IX-X

1. যে বহুভুজের বাহুর সংখ্যা আট, তার অন্তঃকোণ সমূহের যোগফল নীচের কোন্‌টি হবে ?

(ক) 4 সমকোণ (খ) 8 সমকোণ (গ) 12 সমকোণ।

2. নীচের কোন্‌টি বাই লবণ ?

(ক) $CuSO_4$, $5H_2O$ (খ) $NaH\ SO_4$ (গ) $(NH_4)_3\ PO_4$

3. ডিমের সাদা অংশে যে প্রোটিন থাকে তার নাম কি ?
4. নীচের কোন্‌টি সৌরজগতের বৃহত্তম গ্রহ ?

(ক) পৃথিবী (খ) ইউরেনাস (গ) বৃহস্পতি।

5. $_{92}U^{232}$ লেখাটি দেখে কি কি বিষয় জানা যায় ?
6. কস্টিক সোডা দ্রবণে এক ফোঁটা ফেনপথ্যালিন ঢাললে ঐ দ্রবণের রং কেমন হবে ?
7. ইনি 1954 সালের একজন নোবেলজয়ী বিজ্ঞানী। বল দেখি এঁর নাম কি ?

8. 1861 খ্রীষ্টাব্দের 6ই মে তারিখে দু'জন খ্যাতনামা ভারতীয় জন্মগ্রহণ করেছিলেন। তাঁদের নাম কি?
9. 'বেয়নেট' নামটি কি ভাবে সৃষ্টি হয়েছে ?
10. হাইড পার্ক কোথায় অবস্থিত।

গ্রেড III

জুন 89' XI-XII

1. 'হোভারক্র্যাফ্‌ট'এর আবিষ্কর্তা কে ?
2. পিপলস্‌ ডিমোক্রেটিক রিপাবলিক অফ ইয়েমেন-এর স্বাধীনতা দিবস কোনটি ?
3. ভারতের উচ্চতম মূর্তি কোন্‌টি ?
4. ফুটবল খেলার গোলপোস্ট দু'টির মাঝে দূরত্ব কতো ?
5. বিশ্বের সর্বাধিক লোক কোন ভাষায় কথা বলে ?
6. ইনি আমেরিকার এক সম্মানিতা মহিলা। ইনি কে ?

7. লক্ষ্মীবাঈ শারীর শিক্ষণ জাতীয় কলেজ ভারতের কোথায় অবস্থিত ?
8. $C_2H_4O_2$ আণবিক সংকেত বিশিষ্ট জৈব যৌগটি কোন্‌ শ্রেণীভুক্ত ?
9. দেহের কোন্‌ অংশে হিমোগ্লোবিন অক্সিজেনের সঙ্গে বিক্রিয়া করে?
10. বায়ু হতে নাইট্রোজেন অপসারিত করতে কোন্‌ ধাতু ব্যবহৃত হয় ?

জীবজন্তুর বিচিত্র গল্প

অমরনাথ রায়

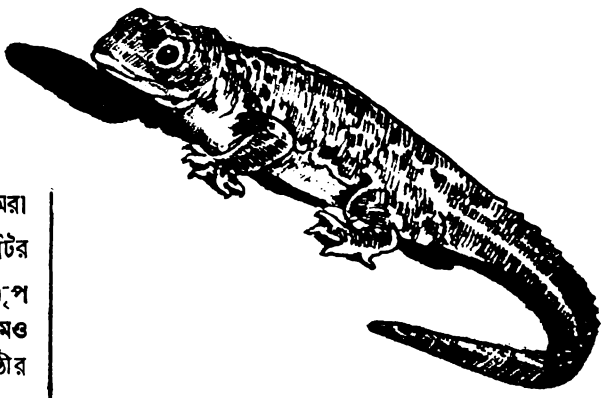

টুয়াটারা

বুকে ভর দিয়ে যে সব প্রাণী চলাফেরা করে তাদের আমরা সরীসৃপ বলে থাকি। টুয়াটারা নামে যে প্রাণীটির কথা এখন বলব সেটি সরীসৃপ জাতীয় প্রাণী। সরীসৃপ জগতে আবার বিভিন্ন গোষ্ঠী আছে। তাদের নামও আলাদা। টুয়াটারা হচ্ছে 'রিনকোসেফালিয়া' গোষ্ঠীর সরীসৃপ।

মানুষের কাছে টুয়াটারা এক বিরাট বিস্ময়। কেন, তা বলি। কোটি কোটি বছর আগে এই পৃথিবীতে যে সব প্রাণী বাস করতো, তাদের অনেকের বংশই আজ লোপ পেয়েছে। অনেকের চেহারা ও জীবনধারা গেছে পাল্টে। প্রকৃতিতে অহরহ পরিবর্তন চলাছ। সেই পরিবর্তনের সঙ্গে যারা নিজেদের মানিয়ে নিতে পারেনি, তারাই অস্তিত্ব হারিয়েছে। যারা কিছুটা পেরেছে, তারা বেঁচে আছে বটে, তবে তাদের চেহারা ও জীবনধারা গেছে পাল্টে।

বিবর্তনের এই ধারায় কয়েকটি প্রাণী আজও টিঁকে রয়েছে। শুধু টিকে নেই; কোটি কোটি বছর আগে যেমনটি ছিল, আজও তেমনি রয়েছে। না চেহারায়, না না জীবনধারায়—কোথাও কোন পরিবর্তন হয় নি—এমনই একটি জীব হচ্ছে এই টুয়াটারা। বিবর্তনের ধারাকে অতিক্রম করে প্রাকৃতিকবিপর্যয় সত্ত্বেও এমনি অপরিবর্তিতভাবে টিঁকে থাকাটা খুবই আশ্চর্যের বিষয়। জীবের শ্রেষ্ঠ যে মানুষ—বিবর্তনের পাকে পড়ে তার চেহারা ও জীবনধারাতেও এসেছে অনেক পরিবর্তন। কিন্তু টুয়াটারার তা আসে নি। এইটাই সবচেয়ে আশ্চর্যের বিষয়। এইজনে ই টুয়াটারা জীববিজ্ঞানী-দের কাছে পরম বিস্ময়। তাই টুয়াটারাকে বলা হয়েছে 'জীবন্ত জীবাশ্ম'।

বংশধারা লোপ না পেলেও বর্তমানে পৃথিবীতে টুয়াটারার সংখ্যা গেছে অনেক কমে। একমাত্র নিউজিল্যাণ্ড-এর উত্তরে কয়েকটি দ্বীপ ছাড়া এখন পৃথিবীর আর কোথাও এ প্রাণী নেই। তাই নিউজিল্যাণ্ড সরকার এই দুর্লভ প্রাণিটিকে সংরক্ষণের জন্যে উপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করেছেন। এখান থেকে বিদেশে টুয়াটারা চালান দেওয়া নিষিদ্ধ করা হয়েছে। এ নিষেধ না মানলে আইন অনুসারে দণ্ড পেতে হয়। একমাত্র গবেষণাগারের প্রয়োজনেই টুয়াটারা এদেশ হতে বিদেশে চালান দেওয়া চলে।

যাই হোক্, এ হেন বিস্ময়কর প্রাণীটি কিন্তু বিরাটকায় নয়। দৈর্ঘ্যে সাধারণতঃ দুই থেকে আড়াই ফুট। দেহটি অসংখ্য ছোট ছোট আঁশে ভরা। তবে এই আঁশ সাধারণ গিরগিটির আঁশের মত নয়। কোন কারণে টুয়াটারা উত্তেজিত হলে তার দেহের আঁশগুলি সজারুর কাঁটার মত খাড়া হয়ে ওঠে।

টুয়াটারার চোখ দুটি থাকে মাথার উপরে। এ ভিন্ন ঐ দুটি নয়নের মাঝে কপালের উপরে থাকে তার তৃতীয় নয়নের সাহায্যে প্রাণীটি কিছুই দেখতে পায় না। তবে কোন কোন জীববিজ্ঞানীর মতে, বাচ্চা অবস্থায় এই তৃতীয় নয়নের কেবল আলো ও আঁধারের তফাৎ বোঝার ক্ষমতা থাকে।

টুয়াটারার লেজটি বেশ মোটা ও চ্যাপ্টা। লেজের আকার অনেকটা দাঁড়ের মতন। ফলে এরা লেজের সাহায্যে স্বাধীন ভাবে সাঁতার কাটতে পারে। এরা সাধারণতঃ মন্থর গতিতে হাঁটে এবং হাঁটবার সময় লেজটিকে মাটির উপর দিয়ে টেনে নিয়ে যায়। জোরে হাঁটতে পারলেও, লাফাতে পারে না মোটেই।

টুয়াটারার গায়ের রঙ বাদামী-সবুজ এবং প্রধানত কীট-পতঙ্গই এদের খাদ্য। নিতান্ত পেটের দায়ে ছাড়া এরা শিকারের খোঁজে বেরোয় না। পেট ভরে খাওয়ার পর এরা পরিপূর্ণ বিশ্রাম নেই। মাটিতে গর্ত খুঁড়ে এরা বাস করে। স্ত্রী-টুয়াটারা গর্তের মধ্যেই একসঙ্গে দশ-বারোটি ডিম পাড়ে। শত্রুর নজর হতে রক্ষার জন্যে ডিমগুলিকে লতাপাতা দিয়ে ঢেকে রাখে। বছরখানেক বাদে ডিম ফুটে বাচ্চা বেরোয়। ধীরে ধীরে এরা বাড়তে থাকে। প্রায় দু'শো বছর এরা বেঁচে থাকে।

কোয়ালা ভল্লুক

যে সব প্রাণি অবলুপ্তির পথে কোয়ালা ভল্লুক তাদের মধ্যে অন্যতম। অষ্ট্রেলিয়া মহাদেশের বাসিন্দা এই প্রাণিটি। অষ্ট্রেলিয়ার দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চলের বনে বড় বড় ইউক্যালিপটাস গাছ আছে। ঐ গাছগুলিতেই বাস করে কোয়ালারা, কারণ ইউক্যালিপটাস গাছের কচি পাতা ও ফুল কোয়ালাদের প্রধান খাদ্য। তাই খাদ্যের জন্যে এক একটি কোয়ালাকে একটি ইউক্যালিপটাস গাছে সাত-আট দিন ধরে পড়ে থাকতে দেখা যায়। এঁরা ঐ গাছের কোনও একটি ডাল শক্তভাবে

আঁকড়িয়ে ধরে মাথা ও হাত-পা গুটিয়ে গোলাকার একটি জড় পিণ্ডের আকারে পড়ে থাকে। এটা ওদের আত্মগোপনের একটা কৌশল। আর ঐ অবস্থাতেই ওরা ঘুমোয়।

কোয়ালারা ক্যাঙারুর নিকট আত্মীয়। ধূসর ছাই রঙের এই প্রাণী আকারে খুবই ছোট ও লেজহীন। পূর্ণবয়স্ক একটি কোয়ালা প্রায় ষাট সেন্টিমিটার লম্বা হয়। এদের কান দুটি গোলাকার এবং লোমশ। দেহও এদের লোমশ। দেহের তুলনায় নাকটি বেশ বড় এবং কালো রঙের।

স্ত্রী-কোয়ালা সাধারণতঃ এক সঙ্গে একটি মাত্র বাচ্চা প্রসব করে। রাতে আহার করে আর দিনের বেলায় গাছের ডাল জড়িয়ে ধরে ঘুমায়। স্ত্রী-কোয়ালাদের পেটে একটি থলি থাকে। শিশু-কোয়ালা কিছুকাল মায়ের পেটের ঐ থলির মধ্যে থেকে বড় হয়। একটু বড় হলে বাচ্চা কোয়ালা মায়ের পিঠ আঁকড়ে ধরে মায়ের সঙ্গে ঘোরে। কোয়ালা বেশ শান্তশিষ্ট প্রাণী, তবে উত্যক্ত হলে রেগে যায়। ওদের রাগ ক্ষণস্থায়ী। সৌখীন লোকদের কাছে এদের গায়ের লোম এবং নরম চামড়ার বেশ সমাদর আছে। শিকারীদের উৎপাতে এরা এখন প্রায় অবলুপ্তির পথে। এদের ভবিষ্যৎ খুবই অনিশ্চিত।

ন্যু

ন্যু এক অদ্ভুত-দর্শন জীব।

দূর থেকে দেখলে মনে হবে—বুঝিবা একটি মোষ দাঁড়িয়ে আছে, কিন্তু কাছে গেলে দেখা যাবে যে, জীবটি হরিণ, মোষ এবং ঘোড়ার দেহ-বৈশিষ্ট্যের সংমিশ্রণে এক বিচিত্র প্রাণী। এর দেহ ও পা গুলি হরিণের মত। মাথাটি প্রকাণ্ড মোষের মত। থুতনি বেশ চওড়া ও লোমে ঢাকা। ন্যুর ঘাড়ের কাছে ঘোড়ার মত লম্বা লম্বা লোম আছে। আর লোম আছে নাকের ছিদ্রে ও তার উপরিভাগে। লেজটিও ঘোড়ার মত। লেজের আগায় ঝোপের মত একগুচ্ছ লোম আছে। বিচিত্রদর্শন ন্যুরা আসলে হচ্ছে হরিণ জাতীয় প্রাণী।

পুরুষ এবং স্ত্রী—উভয় ন্যুয়েরই মাথায় তীক্ষ্ণ ও বাঁকানো এক জোড়া শিং থাকে। শিং দুটি ওদের আত্মরক্ষার হাতিয়ার।

ন্যু আবার কয়েকজাতের হয়। ছবিতে যে ন্যুটি তোমরা দেখতে পাচ্ছ, সেটি উচ্চতায় প্রায় সাড়ে চারফুট। তবে কাঁধের কাছটিতে আর একটু বেশি উঁচু। ন্যু আফ্রিকার জঙ্গলের বাসিন্দা। জঙ্গলে ওদের দল বেঁধে ঘুরে বেড়াতে দেখা যায়। এক একটি দলে দশ থেকে কুড়িটি পর্যন্ত ন্যু থাকে।

প্রধানতঃ চামড়ার লোভেই এদের শিকার করা হয়। শিকারীদের কবলে পড়ে বর্তমানে এই সুন্দর প্রাণীটির বংশ লোপ পেতে বসেছে। এদের বাঁচিয়ে রেখে প্রাকৃতিক পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষার দায়িত্ব আমাদেরই। সেই দায়িত্ব পালনে অনেক দেশই অগ্রণী হয়েছেন। আইন করে কিছু কিছু বিরল প্রাণি হত্যা করা নিষিদ্ধ হয়েছে। আমাদের দেশেও অমনি আইন আছে। তাছাড়া আছে বেশ কিছু অভয়ারণ্য। অভয়ারণ্যে বন্যপ্রাণিরা প্রাকৃতিক পরিবেশে নির্ভয়ে যাতে বসবাস করতে পারে তার আইনগত ব্যবস্থা আছে। এ ব্যবস্থা না করলে আদ্যিকালের অনেক প্রাণী যেমন পৃথিবীর বুক থেকে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে, এ কালের অনেক দুর্লভ প্রাণিরও সেই দশা হবে।

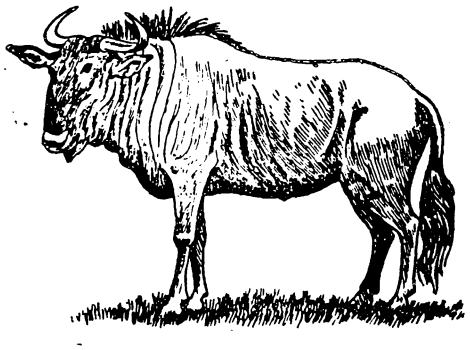

NBT / 99A নিউ ট্রাফিক, খড়্গপুর, মেদিনীপুর।

শব্দকূট

হিমাংশু পাল

পাশাপাশি ঃ

1. 'লিলরি' যার রাজধানী। 3. **উল্টালে** এমন জিনিষ হয়, যার ব্যবহারে গাছের শক্তি বৃদ্ধি পায়। 4. 'হাভানা' যার রাজধানী। 6 কোরাটার এর রাজধানী। 12. অটোয়া যার রাজধানী। 14. 'ইয়েমেন (এপার)'—এর রাজধানী। 15. 'পানামা'-এর রাজধানী। 9 'হানয়'—যার রাজধানী।

উপর নিচ ঃ

2. 'তিব্বত'-এর রাজধানী। 1. 'রাবার্ট'—যার রাজধানী। 5. 'নাছাউ'—যার রাজধানী। 7. 'ইউক্রেন'-এর রাজধানী 8. 'গোয়া'-র রাজধানী 10 'জাম্বিয়া'-এর রাজধানী। 11. 'আক্রা'—যার রাজধানী 13. 'বাহরিন'-এর রাজধানী।

প্রযত্নে - স্নেহাংশু পাল,
চাকদহ (নেতাজী পার্ক), নদীয়া পিন—741222

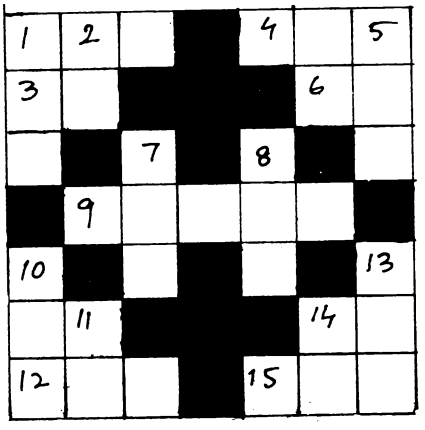

আই কিউ টেস্ট
জুন 1989

1. কোন নামটি বেমানান —
(a) Rambrandt, (b) Shakespeare,
(c) Tin to retto, (d) Raphael.

2. কোনটির আপেক্ষিক তাপ বেশি—
(a) বরফ, (b) লোহা, (c) মার্বেল।

3. উদ্ভিদের উচ্চতা মাপক যন্ত্রটির নাম—
(a) স্ফিগমোস্কোপ, (b) আর্কইওকেটর,
(c) ডিসটেন্সামিটার।

4. লিথিয়াম ও ম্যাগনেসিয়ামের সাদৃশ্যে হেতু কোনটি—
(a) উভয়ের পরমাণু ব্যাসার্ধ সদৃশ, (b) উভয়েই তড়িৎ ধনাত্মক মৌল, (c) উভয়েরই সক্রিয়তা বেশি।

5. কোন ভারতীয়কে ইংরেজরা 'কাইজার-ই-হিন্দ' স্বর্ণপদক দিয়ে সম্মানিত করেন এবং কেন করেন ?

ক্যুইজ কনটেস্ট সমাধান

এপ্রিল 198 ক্যুইজ কনটেস্ট গ্রেড I-এর সমাধান

1. ঋণাত্মক ত্বরণ। 2. কৃতকার্য। 3. প্রোটোপ্লাজম নামক এক ধরণের সজীব বস্তু দ্বারা। 4. হিরুডিনারিয়া গ্রানুলাসা। 5. মৎস্য দলভুক্ত প্রাণির। 6. 'রাফায়েল'—ইউরোপে রেনসাঁস যুগের বিখ্যাত ইতালীর চিত্রশিল্পী। 7. সোবার্স। 8. GUTLIEB DAIMLER (বিশ্বের দ্বিতীয় মোটরগাড়ি নির্মাতা।) 9. অক্টেভিয়ান। 10. অস্থানিক মূল বেরোয়।

এপ্রিল 1989 ক্যুইজ কনটেস্ট গ্রেড II-এর সমাধান

1. অ্যাক্সন। 2. উদ্ভিদের কোষ বিভাজন ঘটানো। 3. সম্রাট আকবরের রাজসভার সর্বশ্রেষ্ঠ সঙ্গীতজ্ঞ। 4. হ্যালহেড এর চেষ্টায়। 5. বেদ। 6. 9·621 7. MERCEDIS JELLINCK এ'র সম্মানেই প্রথম মার্সেডিস মোটর গাড়ির নামকরণ হয়েছিল। 8. এনরিকো ফের্মি। 9. লাল পাতা পাওয়া যায় হিমালয়ের অরণ্যে। 10 চণ্ডীদাস ভাট।

এপ্রিল 1989 ক্যুইজ কনটেস্ট গ্রেড III-এর সমাধান

1. এক গ্যালন। 2. 1971 সালে। 4. মধ্যপ্রদেশের ভিলাই ইস্পাত কারখানা। 4. মনোজ প্রভাকর। 5. 112·0 লিটার। 6. নান্দু নাটেকার, 1961 খ্রীষ্টাব্দে। 7. —273°C। 8. ক্যাথোড রশ্মি তীব্র গতি সম্পন্ন ইলেকট্রন কণার স্রোত। অপর পক্ষে এক্স রশ্মি খুব ছোট তরঙ্গ দৈর্ঘ্য বিশিষ্ট উচ্চ শক্তি সম্পন্ন তড়িৎ চুম্বকীয় তরঙ্গ। 9. ক্রিকেট খেলায় নো-বলে এক রান হয়। 10. পোলো খেলার সঙ্গে যুক্ত।

আই কিউ টেস্ট সমাধান
এপ্রিল '89

1. 22. 2. (a) অ্যাসিড। 3. c-d-e+f
4. (b) ভাইজমান 5. (b) মাথায় টাক পড়া।

শব্দকূট সমাধান

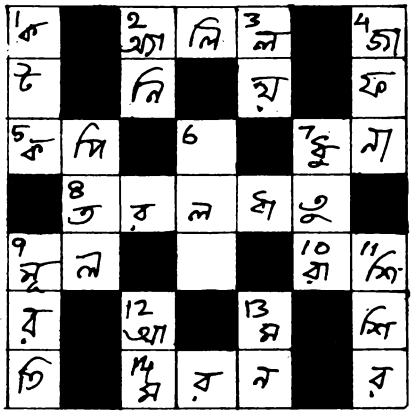

মডেল বানাতে গিয়ে ঃ তিন

রাজেশ গিরি

বুঝা আর একটা জিনিস বুঝতে পারেনি, সেটা হল— রিলের সাথে কলিং বেল বা টেপরেকর্ডার জুড়ে দেওয়ার ব্যাপারটা। ওর কথা হল ডায়াগ্রামের রিলেতে কোন দুটো পয়েন্ট আঁকা নেই যার সাথে কলিং বেল বা টেপ-রেকর্ডার জুড়তে হবে। বুঝতে পারলাম রিলে সম্বন্ধে ওর কোন ধারণা নেই, ফলে রিলে সম্বন্ধে অনেক কথা ওকে বলতে হল, এবং একটা রিলে বের করে ওকে দেখাতে হল। আশাকরি রিলে নিয়ে কিছু করতে গেলে আর কোন অসুবিধা ওর হবে না।

রিলে হল প্রকৃত পক্ষে একটা ইলেক্ট্রোম্যাগনেটিক সুইচ বা বৈদ্যুতিক চুম্বকীয় সুইচ। অর্থাৎ এই যন্ত্রে একটা বৈদ্যুতিক চুম্বকের সাহায্যে এক বা একাধিক সুইচকে অন বা অফ করা যায়। 'চোর তাড়ুয়া'র ক্ষেত্রে হাতের স্পর্শে ট্রিগার অন্ হলে আউট পুট টার্মিনাল (3নং পিন) দিয়ে পজিটিভ কারেন্ট বেরিয়ে আসে এবং ডায়োডের মধ্যে দিয়ে রিলের ইলেক্ট্রোম্যাগনেটের সলিনয়েড (কয়েল)-এর মধ্যে প্রবেশ করার পর ব্যাটারী বা এলিমিনেটর-এর নেগেটিভ (–) পয়েন্ট ফিরে যায় ফলে, সলিনয়েড (কয়েল)-এর মধ্যের চৌম্বক পদার্থ (সাধারণতঃ কাঁচা লোহা) চুম্বকে পরিণত হয় ও তার উপরের লোহার তৈরী সুইচের অংশ (R)-টিকে টেনে নেয়। ফলে তা এসে সুইচের অপর অংশের (S) সঙ্গে যুক্ত হয়, অর্থাৎ সুইচ অন হয়। এই সুইচটাকে কলিং বেলের সুইচ বা টেপের রিমোট কন্ট্রোলের সুইচ হিসাবে ব্যবহার করা হয়েছে চোর তাড়ুয়ার ক্ষেত্রে।

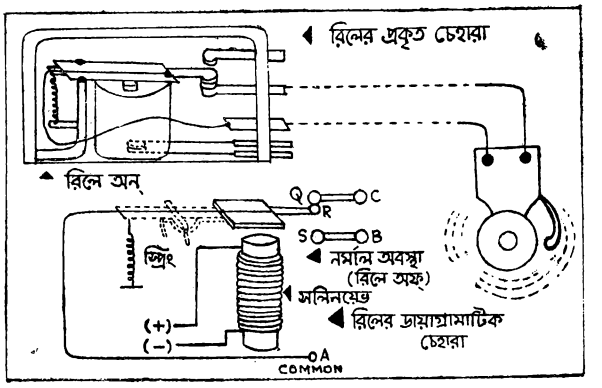

রিলের সলিনয়েডে যখন বিদ্যুৎ থাকে না তখন ওর R অংশটি উপরের Q অংশের সঙ্গে লেগে থাকে স্প্রিং-এর টানে। ফলে তখন ওটাকে একটা সুইচ হিসাবে ব্যবহার করা যায়, যা AC-এর সঙ্গে যুক্ত যন্ত্রকে অন করে আছে। ফলে এই রিলের দ্বারা যখন AB অন হয় তখন AC অফ থাকে এবং যখন AC অন হয় তখন AB অফ থাকে, তাই নর্মাল (বিদ্যুৎ না থাকা) অবস্থায় সবসময় AC অন থাকে এবং P-N এর মাধ্যমে বিদ্যুৎ পাঠিয়ে রিলেকে অন্ করলে AB অন হয়। নর্মাল অবস্থায় AC-এর অন থাকা এবং রিলেকে অন করে AC-কে অফ করার ব্যবস্থাটি ব্যবহার করে অনেক মডেল তৈরি করা যায়। ভবিষ্যতে এই ধরনের মডেল 'নিজে নিজে কর' বিভাগে দেব।

ঘোড়াধরা, ঝাড়গ্রাম, মেদিনীপুর-721507

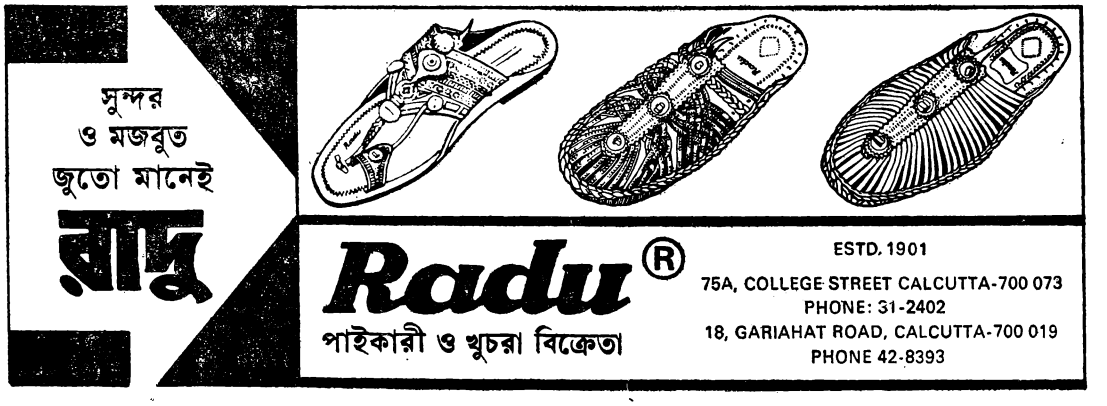

বলতে পারো কেন ?

সুধাংশু পাত্র

গত মাসের প্রশ্ন

চাল থেকে মুড়ি কি ধরনের পরিবর্তন ?

উঃ। চালকে ভেজে মুড়িতে পরিণত করলে ভৌত-পরিবর্তনই হয়ে থাকে। দেখা গেছে, অনুরূপ ব্যবস্থায় চালের 95 শতাংশ স্টার্চ অপরিবর্তিতই থেকে যায়। অবশিষ্ট 5 শতাংশের মত যে স্টার্চ নিরুদিত হয় তাকেও জল দিয়ে শুকিয়ে নিলে অনেকখানি পূর্বাবস্থায় ফিরে আসে। অতএব ঐ পরিবর্তনকে ভৌত পরিবর্তনই বলতে হবে।

এ মাসের নির্বাচিত প্রশ্ন ঃ

"টি. এন. টি." কী ?

জানতে চেয়েছে আশীফ ইকবাল, হাড়োচরণ বিদ্যাপীঠ পটাশপুর, মোদিনীপুর থেকে।

প্রঃ। হাইড্রোজেনকে উদযান এবং অক্সিজেনকে অম্লযান বলার কারণ কী ? দীনদয়াল মণ্ডল, চকবাজার বাঁকুড়া।

উঃ। আসলে "অক্সিজেন" এবং "হাইড্রোজেন" উভয়ের নামকরণের মূলে কিছুটা ভ্রান্তি আছে। তথাপি আবিষ্কারকদের দেওয়া প্রথম নামকে তাঁদেরই সম্মানার্থে বজায় রাখা হয়েছে —ঐ আর্ষ প্রয়োগের ব্যাপার যেন। 'Oxygen' (অক্সিজেন) অর্থে অ্যাসিড প্রডিউসার বা অম্ল উৎপাদক। প্রথম প্রথম বিজ্ঞানীরা যখন হাইড্রাসিডের সন্ধান জানতেন না তখন তাঁদের ধারণা হয়েছিল, প্রতিটি অ্যাসিড বা অম্ল অক্সিজেনেরই যৌগ। তাই নামকরণ করা হয়েছিল অম্ল উৎপাদক বা অক্সিজেন। বাংলায় তাই অম্লযান। পরের দিকে HCl, HBr প্রভৃতি হাইড্রাসিডের সন্ধান পাওয়ায় উপরোক্ত নামকরণ ভ্রমাত্মক প্রতিপন্ন হয়েছে।

অপরদিকে অক্সিজেনের সঙ্গে হাইড্রোজেনকে মিশিয়ে দহন করালে জল উৎপন্ন হতে লক্ষ্য করেছিলেন বিজ্ঞানীরা। তাই উদক বা জল উৎপন্ন করতে সমর্থ হয় বলে সেদিন নামকরণ করা হয়েছিল হাইড্রোজেন এবং বাংলায় উদ্‌যান।

পরের দিকে অবশ্য বিজ্ঞানীরা বুঝতে পেরেছিলেন, অ্যাসিডের মধ্যে অক্সিজেন থাকতেও পারে আবার নাও থাকতে পারে। কিন্তু হাইড্রোজেনের থাকাটা একেবারে বাঞ্ছনীয়। তাই নামকরণের দিক থেকে উল্টোটা অর্থাৎ অক্সিজেনের নাম হাইড্রোজেন এবং হাইড্রোজেনের নাম অক্সিজেন হলেই অধিকতর যুক্তি সঙ্গত হতো।

প্রঃ। লোহায় মরিচা পড়ে, কিন্তু সোনায় মরিচা পড়ে না কেন ? রতনচন্দ্র ঘোষ, কেশবপুর-হুগলী।

উঃ। লোহার উপর মরিচা পড়ার কারণ মাত্র কয়েকটি সংখ্যার আগেই আলোচনা করা হয়েছে। আলোচ্য প্রশ্নে তার প্রয়োজনও নেই। তবে প্রথমে উল্লেখ করতে হয় যে, মরিচা হচ্ছে লোহার অক্সাইড এবং মরিচার জন্য প্রয়োজন হয় জল ও অক্সিজেনের।

লোহার স্থান তড়িৎ-রাসায়নিক শ্রেণীতে হাইড্রোজেনের উপরে। তাই কোননা কোন অবস্থায় জলীয় বাষ্প বা জলের সঙ্গে বিক্রিয়া ঘটিয়ে লোহা তার অক্সাইড গঠন করতে সক্ষম হয়।

সোনার স্থান তড়িৎ রাসায়নিক শ্রেণীর একেবারে তলায়। সবচেয়ে কম ইলেকট্রো পজিটিভ—একেবারে সম্ভ্রান্ত ধাতুদের মধ্যে অন্যতম। অক্সিজেনের সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে যুক্ত হয়েও অক্সাইড গঠন করতে পারে না। অপর দিকে হাইড্রোজেনের স্থান সোনা থেকে অনেক উপরের দিকে। অর্থাৎ হাইড্রোজেন সোনা অপেক্ষা অনেক বেশী ইলেকট্রোপজিটিভ। তাই কোন অবস্থাতেই জল বা জলীয় বাষ্পের সঙ্গে সোনা বিক্রিয়া ঘটাতে সক্ষম হয় না। আর ঐ কারণে সোনার উপর মরিচাও পড়ে না।

কালক্রমে সোনার ঔজ্জ্বল্যকে ধীরে ধীরে হ্রাস পেতে দেখা যায়। তার কারণ কিন্তু মরিচা জাতীয় কিছু নয়।

প্রঃ। সাবানে জামা কাপড় পরিষ্কার হয় কেমন করে এবং গায়ে সাবান দিলে ময়লা উঠে যায় কেন ? (1) অনুপ কুমার দাস এবং সুকুমার দাস, পুরুষোত্তমপুর, এগরা, মেদিনীপুর ; (2) দীনেশ ঘোষ, একরপুর, হাওড়া।

উঃ। সাবান হচ্ছে উচ্চতর আণবিক ওজন বিশিষ্ট ফ্যাটি অ্যাসিডের সোডিয়াম বা পটাসিয়াম লবণ। তাই এই যৌগটি জলে সমসত্ত্ব দ্রবণ প্রস্তুত করতে পারে না। জলের

পৃষ্ঠতলে যৌগের ভারি তথা লম্বা অণুগুলো অনেকটা লাঠির মত ভাসমান অবস্থায় থাকে।

জলের পৃষ্ঠতলকে অনুরূপভাবে ক্ষতবিক্ষত করে বলে জলের পৃষ্ঠটান কমে যায়। তাই দ্রবণটিকে নাড়লে বায়ু ঢুকে পড়ে এবং বুদবুদের আকারে দীর্ঘ সময় স্থায়ী হয়। একেই আমরা সাধারণতঃ ফেনা বলে থাকি। আর ঐ ফেনাই দেহের কিংবা কাপড়ের ময়লার সূক্ষ্ম কণাগুলোকে ভিজিয়ে দেয় এবং প্রলম্বিত অবস্থায় জলের মধ্যে আনতে সাহায্য করে। সহজভাবে বললে বলতে হয় যে, সাবান ইমালসান বা কলোয়েড স্টেবিলাইজার হিসেবে কাজ করে।

প্রঃ। অ্যালুমিনিয়ামের পাত্রে টিউব ওয়েলের জল রেখে ব্যবহার করলে অল্পদিনে ফুটো হয়ে যেতে দেখা যায়। কিন্তু পুকুরের জল ব্যবহার করলে ফুটো হতে অনেক বিলম্ব হয়. কেন? ভগবতী সামন্ত, পাইকপাড়া, কল্লুকহাট, মেদিনীপুর।

উঃ। নলকূপের জল খরজল। ওতে অন্যান্য খরতার সঙ্গে লৌহঘটিত খরতা ও বিদ্যমান। বিক্রিয়ার গতি যদিও ভয়ানক মন্থর তবুও অ্যালুমিনিয়ামের সঙ্গে ওর বিক্রিয়া ঘটে [$FeCl_3 Al \rightleftharpoons AlCl_3 + Fe$]। বিক্রিয়ায় মুক্ত লোহকণা পাত্রের গায়ে সঞ্চিত হয় এবং গঠন করে এক একটি তড়িৎ-কোষ (গ্যালভানির সেল)। অপর দিকে জল বা কোন লবণের জলীয় দ্রবণ তড়িৎবিশ্লেষ্য পদার্থরূপে কাজ করে। স্থানীয় ক্রিয়া জনিত কারণের জন্য উৎপন্ন তড়িৎ বিক্রিয়া-স্থলেই নষ্ট হয়। অ্যালুমিনিয়াম পাত্রের গাত্রদেশ থেকে Al পরমাণু Al^{+++} আয়নরূপে দ্রবীভূত হয়। তাই ক্ষয় হতে হতে এক সময় ফুটো হয়ে যায়। যদিও খরজলের অন্যান্য অশুদ্ধি রাসায়নিক সাম্যাবস্থা আনয়নের জন্য কমবেশী পাত্রের গায়ে সঞ্চিত হয় [ধাতু$^{+}$ + $Al^{-} \rightleftharpoons$ ধাতু Al^{+++}]। এমনকি সামান্যতম অশুদ্ধিও অ্যালুমিনিয়ামের সঙ্গে তড়িৎ রাসায়নিক কোষ উৎপন্ন করে এবং বিশুদ্ধ জলের সঙ্গেও অতি মন্থর গতিতে হাইড্রোজেন উৎপন্ন করতে পারে। অ্যালুমিনিয়ামের স্থান আবার তড়িৎ রাসায়নিক শ্রেণীর একেবারে উচ্চে এবং ঐ কারণে অ্যালুমিনিয়ামের ক্ষয় অপরাপর ধাতু অপেক্ষা বেশী চোখে পড়ে।

পুকুরের জল কিন্তু মৃদু জল। মৃদু জলে ধাতব আয়ন প্রায় থাকে না বললেও চলে। অ্যালুমিনিয়াম ধাতুও প্রায় বিশুদ্ধ। মৃদু জলের দ্বারা কোন স্থানীয় ক্রিয়া বিশেষ ঘটে না। তাই ক্ষয়ও হয় না তাড়াতাড়ি।

প্রঃ। উইলসন ক্লাউড চেম্বারের গঠন কেমন? এর দ্বারা কীভাবে α কণাকে সনাক্ত করা হয়? সুভাষচন্দ্র পোড়েল, গ্রাম-পিয়ারাপুর, পোঃ-হরালী, হাওড়া।

উঃ। উইলসন ক্লাউডচেম্বার (1897 সালে আবিষ্কৃত) বা মেঘ প্রকোষ্ঠের মূল অংশ একটি বিশেষ প্রকোষ্ঠ মাত্র। প্রকোষ্ঠটির আয়তন একটি পিস্টনের সাহায্যে প্রয়োজন অনুযায়ী বাড়ানো কিংবা কমানো যায়। প্রকোষ্ঠটিকে প্রথমে অ্যালকোহল বাষ্পের দ্বারা সম্পৃক্ত রাখা হয়, পরে ঐ বাষ্পকে সম্প্রসারিত করলে অতি সম্পৃক্ত হয়ে পড়ে এবং তখনই সে চেষ্টা করে তরলে পরিণত হতে। কিন্তু প্রকোষ্ঠের মধ্যে কোন সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম কণিকা না থাকার জন্য কোন কিছুকে অবলম্বন করে বাষ্প জমাট বাঁধতে পারে না।

অনুরূপ অবস্থায় যদি প্রকোষ্ঠের ভেতর দিয়ে কোন কণাকে পাঠানো হয় এবং কণাটি যদি আয়ন সৃষ্টি করতে সমর্থ হয় তাহলে কণাটির গমন পথে সৃষ্ট আয়নগুলোর উপর অ্যালকোহল বাষ্প জমে উঠে এবং কণার সঞ্চরণ পথটি একটি রেখার আকারে দেখা যায়। বিজ্ঞানীরা উক্ত রেখাকে Track বলেন। উপযুক্ত আলোর ব্যবস্থা করে ক্যামেরার সাহায্যে সেই রেখা বা Track-এর আলোকচিত্রও গ্রহণ করে।

আকাশে মেঘ যেভাবে সৃষ্টি হয়, অনেকটা সেই ভাবে যন্ত্রটির প্রকোষ্ঠে মেঘ সৃষ্টি করা হয় বলে নাম ক্লাউড চেম্বার। তবে α কণারাই পারে Track গঠন করতে প্রোটন, ইলেকট্রনরা পারে না। এর মূলে যুক্তি হচ্ছে, বাতাসের ভেতর দিয়ে α কণারা ধাবিত হলে বাতাসের নাইট্রোজেনও অক্সিজেন পরমাণুর সঙ্গে সংঘর্ষ বাধায় এবং বিচ্যুত হয় ইলেকট্রন কণিকা। ওতে পরমাণুর তড়িৎ সাম্য নষ্ট হয়ে যায় এবং পরমাণুটি ধনাত্মক আধানযুক্ত হয়ে পড়ে।

α কণার আঘাতে ইলেকট্রনের বহিষ্কারকে বলে আয়নি-জেশন। মেঘ প্রকোষ্ঠের ভেতর দিয়ে আলফা কণা ধাবিত হলে তার গতিপথে বাতাসের অণু পরমাণুরা সংঘাত সৃষ্টি করে এবং আয়নে রূপান্তরিত হয়। সঙ্গে সঙ্গে আয়নদের উপর অ্যালকোহলের বাষ্প জমা হয়ে উৎপন্ন করে পুরু ট্রাক। [যন্ত্রটির আবিষ্কর্তা উইলসন। পরে বিজ্ঞানী গাইগর এবং বিজ্ঞানী ম্যুলর যন্ত্রটির উন্নতি সাধন করেন এবং নানা ধরনের কণা সন্ধানী যন্ত্র আবিষ্কার করেন। তাঁদের তৈরি কণা সন্ধানী যন্ত্রটির নাম গাইগর ম্যুলর কাউন্টার।]

প্রঃ। নিউক্লিয় বিভাজন কেমন করে হয়? নন্দিনী চক্রবর্তী, কলিকাতা-47।

নিউক্লিয়ার ফিসন কী? বিশ্বজিৎ মল্লিক, গোপাল বোস লেন, সিঁথি, কলি-50।

উঃ। পরমাণুর নিউক্লিয়াসে অবস্থিত কণাগুলোকে সহজে বিচ্ছিন্ন করা যায় না। তবে সাইক্লোট্রন প্রভৃতি যন্ত্রের মাধ্যমে বাহির থেকে প্রোটন বা নিউট্রন দিয়ে পরমাণুর নিউক্লিয়াসকে তীব্রভাবে আঘাত করলে অনেক সময় নিউ-ক্লিয়াসের একটা টুকরা ভেঙ্গে পড়ে এবং কিছু কিছু শক্তি নির্গত হয়।

প্রকৃতির তরতাজা স্বাদে ভরপুর!

Bijoli Grill

Zest

তাজা আনারস পানীয়

বার্ষিক পরীক্ষা শেষ। এবার নতুন ক্লাসের পালা। নতুন বইখাতা নিয়ে স্কুলে যাওয়া হবে শুরু। এই সময়টাই তো সবচেয়ে আনন্দের। তোমাদের এই আনন্দের সঙ্গী করে নাও বিজলী গ্রীলের 'জেস্ট' কে।

তাজা আনারসের স্বাদে-ভরা মজাদার পানীয় 'জেস্ট' তোমাদের শরীর ও মনকে স্ফূর্তিতে ভরপুর করে তুলবে।

Zest কে ক'রে সাথী,
ওগো খুশীর মেজাজে মাতি!

Artificially flavoured. Contains no fruit juice or fruit pulp.

বিজলী গ্রীলের উৎকৃষ্ট উৎপাদন

কিশোর বিজ্ঞান পরিষদ

এপ্রিল '88 থেকে মার্চ '89 পর্যন্ত কুইজ কনটেস্ট, আই কিউ টেস্ট প্রভৃতি প্রতিযোগিতার ফলাফল জুন '88 থেকে মে '89 পর্যন্ত প্রতি সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছে। পুজো সংখ্যায় প্রকাশিত সুপার কুইজ কনটেস্ট ও সুপার আই কিউ টেস্ট প্রতিযোগিতার ফলাফল ঘোষিত হয়েছে ডিসেম্বর '88 সংখ্যায়।

গত এক বছরে বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় সফল প্রতিযোগীদের কাছে পুরস্কার ও উপহারের কুপন পাঠানো হয়েছে। (এই বিষয়ে গত মে '89 সংখ্যায় বিস্তারিত ভাবে জানানো হয়েছে) যারা এখনও চিঠিসহ কুপন পাওনি বা চিঠি পেয়ে পুরস্কার নাওনি তাদের অবিলম্বে দপ্তরে যোগাযোগ করতে বলা হচ্ছে।

'বুদ্ধিশুদ্ধি' প্রতিযোগিতায় সফল প্রতিযোগীদের গত জানুয়ারি '88 থেকে পত্রিকা পাঠানো হচ্ছে।

এবার থেকে প্রতি মাসেই বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় সফল প্রতিযোগীদের উপহার ও পুরস্কারের কুপন বাড়ির ঠিকানায় পাঠানো হবে এবং প্রাপকদের দপ্তর থেকে পুরস্কার ও উপহার গ্রহণ করতে হবে। 10 জুন এর মধ্যে যোগাযোগ না করলে প্রাপকদের সাধারণ ডাকে পুরস্কার ও উপহার পাঠানো হবে। যারা রেজিস্টার্ড ডাকে পেতে ইচ্ছুক তাদের আলাদা ডাক ব্যয় বহন করতে হবে।

পরিচালক

সফল উত্তরদাতাদের নাম

এপ্রিল '89-এ প্রকাশিত আই-কিউ-টেস্ট-এর সবকটি প্রশ্নের সঠিক উত্তর দিয়ে (আগে আসার ভিত্তিতে) যারা সার্টিফিকেট পাবে :

1. **তন্ময় মহাপাত্র**, 56/F, বেলেঘাটা মেইন রোড, কলকাতা-700 010।

2. **তরুণকুমার বেরা**, গ্রাম—সুরমনকার, পোস্ট—পাঁশকুড়া, জেলা—মেদিনীপুর।

3. **কৌশিক বাগচী**, 15/31A, বি. জি. লেন, কলকাতা-700 034।

4. **পিনাকী দত্ত**, 47, বড়জোনপুর, পোস্ট—কাঁচরাপাড়া, জেলা—উঃ 24-পরগণা।

5. **উৎপল বসু**, প্রযত্নে উদয় বসু, নেতাজী সুভাষ রোড, গ্রাম+পোস্ট—হরিনাভি, জেলা—24 পরগণা (দঃ), পিন-743359।

6. **শুভ্র চ্যাটার্জী**, প্রযত্নে, সুনীল চ্যাটার্জী, রায়েরবেড়, চুঁচুড়া-712101, জেলা—হুগলী।

7. **সব্যসাচী ভট্টাচার্য**, প্রযত্নে, সমীর নাথ ভট্টাচার্য, 19/1, আর. এন. টি. রোড, পোস্ট—হরিনাভি, জেলা—24-পরগণা (দঃ)।

8. **সৌমেন চ্যাটার্জী**, 176/4, শিবপুর রোড, হাওড়া—711 102।

9, **শুভাশিস সরকার**, প্রযত্নে, বি. সি. সরকার, উলুবেড়িয়া স্টেশন রোড, পোস্ট—উলুবেড়িয়া, জেলা—হাওড়া।

10. **শিপ্রা পাল**, প্রযত্নে, স্নেহাংশু পাল, পোস্ট—চাকদহ (নেতাজী পার্ক) জেলা—নদীয়া, পিন-741222।

এপ্রিল '89-এ প্রকাশিত কুইজ কনটেস্ট গ্রেড-I-এর সর্বাধিক প্রশ্নের সঠিক উত্তর দিয়ে (আগে আসার ভিত্তিতে) যে তিনজন পুরস্কার পাবে :

1. **সৌরভ কুমার দে** (দশটি প্রশ্নের সঠিক উত্তর) 115/2, বেলেঘাটা মেইন রোড, কলকাতা-700010

2. **তন্ময় মহাপাত্র** (নয়টি প্রশ্নের সঠিক উত্তর) 56/F, বেলেঘাটা মেইন রোড, কলকাতা-700 010

3. **সুস্মিতা বিশ্বাস** (নয়টি প্রশ্নের সঠিক উত্তর) ত্রিবেণী টিসু লিমিটেড কোঃ নং F/796 চন্দ্রহাটি, জেলা হুগলি।

এপ্রিল '89-এ প্রকাশিত কুইজ-কনটেস্ট গ্রেড-I-এর নয়টি প্রশ্নের সঠিক উত্তর আরও যারা দিতে পেরেছে :

কলকাতা : পার্থদাস, ধ্রুবজ্যোতি বসু, ইন্দ্রজিৎ চক্রবর্তী, রাজীব দত্ত।
24-পরগণা : বাসন্তী চ্যাটার্জী, সংঘমিত্রা নাগ।
হাওড়া : সৌম্যদীপ মণ্ডল, সৌমেন চ্যাটার্জী।

হুগলী ঃ পার্থ শেঠ।

নদীয়া ঃ শুভ্রদীপ বিশ্বাস।

মেদিনীপুর ঃ প্রদীপ দাস।

বাঁকুড়া ঃ রূপাঞ্জন সাহা।

এপ্রিল '89-এ প্রকাশিত ক্যুইজ কনটেস্ট গ্রেড-III-এর সবকটি প্রশ্নের সঠিক উত্তর দিয়ে (আগে আসার ভিত্তিতে) যে তিনজন পুরস্কার পাবে ঃ

1. **অশোক সাধুখাঁ**, প্রযত্নে, তপন সাধুখাঁ, 47/1, আড়িয়াদহ এন. এস. ফিডার রোড, কলকাতা-700057

2. **তরুণতপন গরাই**, প্রযত্নে, শরৎকুমার গরাই. গুসকরা, বর্ধমান।

3. **অলোক চক্রবর্তী**, প্রযত্নে, গোপালচন্দ্র চক্রবর্তী, নিউ ডাঙ্গালপাড়া, পোস্ট —সিউড়ি, জেলা —বীরভূম, পিন —731101।

এপ্রিল '89-এ প্রকাশিত ক্যুইজ কনটেস্ট গ্রেড-III-এর সবকটি প্রশ্নের সঠিক উত্তর আরও একজন দিতে পেরেছে ঃ

বীরভূম ঃ পথিকৃৎ চ্যাটার্জী।

এপ্রিল '89-এ প্রকাশিত ক্যুইজ কনটেস্ট গ্রেড-II এর উত্তর প্রদান আশানুরূপ না হওয়ায় কোন নাম প্রকাশ করা সম্ভব হলো না।

ভ্রম সংশোধন ঃ

এপ্রিল '89-এ প্রকাশিত আই-কিউ টেস্ট এর 2নং প্রশ্নের সমাধানে (a) অ্যাসিডের পরিবর্তে (c) এস্টার পড়তে হবে।

এপ্রিল '89-এ প্রকাশিত ক্যুইজ কনটেস্ট গ্রেড-II এর সমাধান অংশে নং 6-এ 9·621 এর পরিবর্তে 0.621 এবং নং 9-এ লাল পাতার পরিবর্তে লাল পাণ্ডা পড়তে হবে। মুদ্রণ প্রমাদের জন্য আমরা দুঃখিত।

ক্যুইজ কনটেস্ট
গ্রেড—I II III-এর উপহার

সবকটি প্রশ্ন বা সর্বাধিক প্রশ্নের সঠিক উত্তর দানের ভিত্তিতে (আগে আসার ভিত্তিতে) প্রথম তিনজনকে পুরস্কৃত করা হবে। তিনজনেরই পুরস্কারের মূল্যমান সমান।

আই-কিউ-টেস্টের সফল উত্তর-দাতাদের আগে আসার ভিত্তিতে 10টি সার্টিফিকেট দেওয়া হবে।

জুন '89 সংখ্যার
ক্যুইজ কনটেস্টের উপহার

গ্রেড-1 **তুষারলোকের রহস্য**
ক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য

গ্রেড-2 **নাকনাটিয়ার রহস্য**
শিশিরকুমার মজুমদার

গ্রেড-3 **নীল মানুষের কাহিনী**
সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়

স্মৃতিশক্তি, চিন্তাশক্তি, মনের একাগ্রতা বাড়াতে এবং শরীর সুস্থ ও সতেজ রাখতে ব্যবহার করুন

মেনোলিয়া

স্মৃতিশক্তি ও স্বাস্থ্য সতেজ রাখার উৎকৃষ্ট টনিক

প্রতিযোগিতার কুপন

ক্যুইজ কনটেস্ট—1/2/3 এবং আই কিউ টেস্টে উত্তরের সঙ্গে এই কুপনটি কেটে পাঠাতে হবে।

আমি.....

.....

বাড়ির ঠিকানা.....

.....

বয়স..... শ্রেণী .....

বিদ্যালয়ের নাম .....

.....

আই কিউ টেস্ট / ক্যুইজ কনটেস্ট গ্রেট 1/2/3-এর উত্তর পাঠালাম।

কেমিক্যাল রেক্টিফায়ার

শ্রীমন্ত গুহ

স্কুল বা কলেজের যে সমস্ত ছেলেমেয়েরা হবি ইলেক্ট্রনিক্স নিয়ে নাড়াচাড়া করে, তাদের পক্ষে এই পরীক্ষাটা আশা করি বেশ মজাদার হবে। যদিও কেমিক্যাল রেক্টিফায়ারটা হলো বহু প্রাচীন, যখন কোন সেমি-কন্ডাক্টার রেকটিফায়ার বা ভাল্ব রেক্টিফায়ার আবিষ্কার হয়নি, তখন স্টোরেজ ব্যাটারিকে চার্জ করার জন্য এই পদ্ধতির সাহায্য নেওয়া হতো।

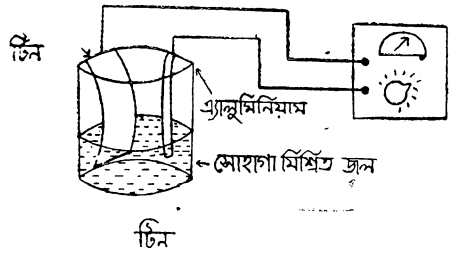

কেমিক্যাল রেক্টিফায়ার তৈরি হতো একটা ইলেক্ট্রোলাইটিক সল্যুশনের মধ্যে দুটো ধাতুর ইলেকট্রোড দিয়ে। যখন ওর মধ্যে এ. সি. বা অলটারনেটিং কারেন্ট দেওয়া হতো, তখন কেমিক্যাল অ্যাক্শনের জন্য কোন এক ইলেক্ট্রোডের মধ্যে আধা পরিবাহির আস্তরন (Semiconductor Film) তৈরি হতো, সেই সময় সেটাকে ডায়োড রেক্টিফায়ার হিসাবে ব্যবহার করা হতো।

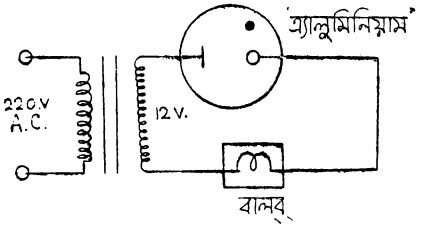

এখন ইচ্ছে করলে তোমরাও এই ছোট্ট মডেলটি তৈরি করে দেখতে পার। এর জন্য যা যা জিনিস চাই তা হলো : একটি ছোট কাচের পাত্র। (আমি চারমিস্ ক্রীমের শিশি ব্যবহার করেছিলাম)। আধ ইঞ্চি চওড়া ও তিন ইঞ্চি লম্বা দুটো ইলেক্ট্রোড, যথাক্রমে একটি টিনের পাত ও অপরটি অ্যালুমিনিয়ামের মোটা তার। প্রথমে আধ আউন্সের মত সোহাগা নিয়ে কাঁচের পাত্রে ঢেলে বেশ কিছু জল ঢেলে নাড়তে থাক, যতক্ষণ না সোহাগা সম্পূর্ণ জলের সঙ্গে মিশে যায়, এবার দুই প্রান্তে দুটো ইলেক্ট্রোড ক্লীপের মত আটকে দাও। প্রথম চিত্রে লক্ষ্য কর। মাল্টি মিটারের সাহায্যে দুই ইলেক্ট্রোডের ফরোয়ার্ড ও রিভার্স রেজিস্টেন্স মেপে নিতে পার। (আমার ক্ষেত্রে হয়েছিল একদিকে 20,000 ওহোম্‌স এবং অপরদিকে প্রায় 1 মেগে মত।) এবারে 6 অথবা 12 ভোল্টেয় স্টেপডাউন ট্রান্সফরমার নিয়ে দ্বিতীয় চিত্র অনুযায়ী সার্কিটটি তৈরি কর। এখানে যে পাইলট ল্যাম্পটি দেখান হয়েছে, সেটার ভোল্টেজ এবং কারেন্ট রেটিং ট্রান্সফর্মারটি অনুযায়ী হবে। এবারে ট্রান্সফর্মারের প্রাইমারিতে এ. সি. ভোল্টেজ দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে দেখা যাবে বাল্বটির ঔজ্জ্বল্য প্রথমে বেড়ে যাবে, তারপর ধীরে ধীরে ঔজ্জ্বল্য কমে আসতে থাকবে অর্থাৎ ঐ সময় ভখন দেখা যাবে অ্যাল্যুমিনিয়াম ইলেক্ট্রোডের চারপাশ থেকে ভালমত বুদ বুদ শুরু হচ্ছে। এর মানে হলো সেমিকনডাক্টার আস্তরণ তৈরি হওয়া এবং রেক্টিফায়ারের ইনটারন্যাল রেজিস্টেন্স বৃদ্ধি পাওয়া। এই অবস্থায় মিনিট 15 রেখে দিয়ে ট্রান্সফর্মারের প্রাইমারির কানেকশন খুলে ফেল্‌তে হবে এবং ইলেক্ট্রোড দুটোর পজিশন যেন সরে না যায়। এবারে মাল্টি মিটার দিয়ে ইলেক্ট্রোড দুটোর রেজিস্টেন্স মাপলে দেখ যাবে, রিভার্স রেজিস্টেন্স অনেক বেড়ে গেছে।

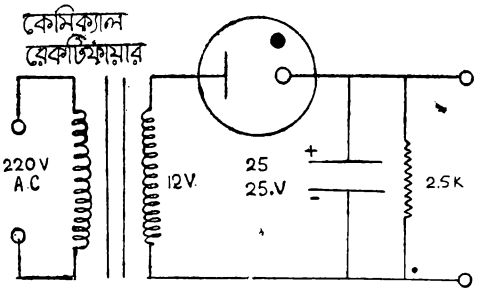

এবারে পরবর্তী তৃতীয় চিত্র অনুযায়ী সার্কিট তৈরি করলেই সম্পূর্ণ কেমিকেল রেকটিফায়ারটি তৈরি হল।

পদার্থ বিদ্যা বিভাগ, বিশ্বভারতী, শান্তিনিকেতন-731235।

নিশ্চিত সাফল্য

১ টাকার বিনিময়ে
সপ্তাহের প্রতি বুধবার
পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য লটারী
দিচ্ছে

প্রথম পুরস্কার

১,৫০,০০০ টাকা

আরও হাজার হাজার পুরস্কার

প্রতি বুধবার পূর্ব নির্দিষ্ট স্থানে, নির্দিষ্ট সময়ে
খেলা হয়।

আপনার সাদর আমন্ত্রণ

আরো জানবার জন্য ঃ
অধিকর্তা
পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য লটারী
৬৯ গণেশচন্দ্র অ্যাভিনিউ কলকাতা-৭০০ ০১৩
ফোন ঃ ২৬ ৪৬৮৮/২৬ ৪৬৮৯

ক্লাস অ্যানুয়াল

ও

প্রতিযোগিতামূলক
পরীক্ষায়
সাফল্যের জন্য

গ্রন্থসূচী : সায়েন্স ক্যুইজ ● গণিত ক্যুইজ ● নলেজ ক্যুইজ ফিজিক্স ক্যুইজ ● কেমিস্ট্রী ক্যুইজ ● লাইফ সায়েন্স ক্যুইজ

লেখকসূচী : অমরনাথ রায় ● অরূপরতন ভট্টাচার্য ● অলক চক্রবর্তী ● তারকমোহন দাস ও সীমা সেন

ক্যুইজ সেট

প্রকাশিত হয়েছে
৬টি বইয়ের
সেট ৫০.

স্টল নং ৫১০
শৈব্যা প্রকাশন বিভাগ

R/NO 37390/81 KISHORE JNAN BIJNAN Regd. No. WBEC 316 June '89 9th yr VOL3

ক্লাসিক বিজ্ঞান সাহিত্য

আধুনিক ভারতের বিজ্ঞান চর্চার প্রাণপুরুষ আচার্য জগদীশ চন্দ্র বসুর বহুমুখী প্রতিভার একটি অন্যতম প্রতিভা তাঁর সাহিত্য রচনা। জগদীশ চন্দ্রের প্রথম বাংলা গ্রন্থ 'অব্যক্ত' প্রকাশিত হয় ১৩২৮ সালে। কিন্তু জগদীশ চন্দ্রের বাংলা রচনার সংখ্যা অনেক। কিশোরদের জন্যে লেখা রচনার সংখ্যাও কম নয়। সে সমস্ত রচনাই বিভিন্ন পত্র পত্রিকায় ছড়িয়ে রয়েছে। আজকের এই বিজ্ঞান ও প্রগতির যুগে জগদীশ চন্দ্রের রচনাবলীর সঙ্গে কিশোরদের পরিচিত করিয়ে দেবার উদ্দেশ্যেই প্রকাশিত হচ্ছে—কিশোর রচনা সমগ্র। গ্রন্থটি সম্পাদনা করেছেন দিবাকর সেন। বহু দুষ্প্রাপ্য ফটো ও অপ্রকাশিত পত্রাবলী সহ গ্রন্থটির দাম মাত্র ১৫্।

জগদীশ চন্দ্র বসু **কিশোর রচনা সমগ্র**

আধুনিক ভারতীয় রসায়ন বিজ্ঞানের জনক আচার্য প্রফুল্ল চন্দ্র রায়ের কর্মবহুল জীবনের অনেক সময়ই কেটেছে সমাজ সেবায়, জাতি গঠনে ও দেশকে স্বয়ম্ভর করে তোলায়। শুধু তাইই নয়, বিজ্ঞানকে জনপ্রিয়করণে ও জাতি গঠনে তিনি লেখনীও ধরেছেন—লিখেছেন নানা প্রবন্ধ। কিন্তু সেইসব সার্থক রচনা অপ্রকাশিত চিঠিপত্র, দুষ্প্রাপ্য ফটোগ্রাফ্ সম্বলিত গ্রন্থটি সম্পাদনা করেছেন বিভাবসু ঘোষ। দাম ১৫্

প্রফুল্ল চন্দ্র রায় **কিশোর রচনা সঙ্কলন**

জনপ্রিয় স্তরে বিজ্ঞান সংক্রান্ত বহু লেখাই লিখেছেন কৃষি বিজ্ঞানী মেঘনাদ সাহা, বক্তৃতাও দিয়েছেন বাংলায় ও ইংরাজীতে। তবে ছোটদের জন্যে আলাদ পত্র পত্রিকাতে তিনি তেমন লেখেন নি। এর একমাত্র ব্যতিক্রম শিশুভারতী পত্রিকা।

শিশুভারতীতে প্রকাশিত পৃথিবীর আকার ও অবস্থান, যন্ত্রবিজ্ঞান, রঙ্কন রশ্মি প্রভৃতি প্রবন্ধগুলি নিয়েই প্রকাশিত হয়েছে মেঘনাদ আহার কিশোর রচনা সঙ্কলন। অপ্রকাশিত পত্রাবলী ও দুষ্প্রাপ্য ফটো সম্বলিত গ্রন্থটির সম্পাদনা করেছেন এণাক্ষী চট্টোপাধ্যায় ও শান্তিময় চট্টোপাধ্যায়। দাম ১৫্

মেঘনাদ সাহা **কিশোর রচনা সঙ্কলন**

বিজ্ঞানী সত্যেন্দ্রনাথ বসু বিশ্বের প্রথম সারির বিজ্ঞানীদের মধ্যে অন্যতম। শুধু তাই নয় মাতৃভাষার মাধ্যমে দেশের জনসাধারণের কাছে বিজ্ঞানের কথা প্রচার ও প্রসারের জন্য তাঁর ঐকান্তিক প্রচেষ্টা তাঁকে এক অনন্য বিশিষ্টতা দান করেছে। তাঁর এই প্রচেষ্টার অন্যতম স্বাক্ষর জ্ঞান ও বিজ্ঞান পত্রিকার প্রকাশ, যে পত্রিকায় তিনি মাঝেমাঝেই বিজ্ঞান প্রবন্ধ লিখেছেন—বিজ্ঞানী ও মণীষীদের স্মৃতিচারণাও করেছেন। সেই সব রচনাবলী থেকে শুধুমাত্র কিশোর পাঠ্য রচনাবলীর বর্তমান সংস্করণটি নিঃসন্দেহে বিজ্ঞান পিপাসু পাঠকদের খুশী করবে। আচার্যদেবের অপ্রকাশিত চিঠিপত্র ও দুষ্প্রাপ্য ফটো সম্বলিত গ্রন্থটির সম্পাদনা করেছেন রবীন বন্দ্যোপাধ্যায়। দাম ১৫্

সত্যেন্দ্রনাথ বসু **কিশোর রচনা সঙ্কলন**

শৈব্যা প্রকাশন বিভাগ
৮৬/১ মহাত্মা গান্ধী রোড, কলকাতা-৯